পরমাণু রহস্য

গর্ডন এভান্স্ ডীন

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সন ১২৭৩ সাল

—দুই টাকা—

Bengali Translation of
Report on the Atom
by
Gordon Evans Dean
Original Edition published by Alfred A. Knopf Inc.

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীনির্মলেন্দু ভদ্র কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরমাণু সম্বন্ধে আমেরিকার দৃষ্টি

অন্য সকলের মতই আমিও আমেরিকার পারমাণবিক কার্যসূচীর কথা প্রথম জানতে পারি ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে। সেদিনই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে নিম্নলিখিত ঘোষণাটি প্রচার করেন :—

'জাপানী সামরিক বাহিনীর একটি বিশিষ্ট ঘাঁটি, হিরোশিমা সহরের উপর ষোল ঘণ্টা আগে আমেরিকার বিমান থেকে একটি বোমা ফেলা হয়। এই বোমাটি বিস্ফোরক শক্তিতে বিশ হাজার টন পরিমিত টি এন্ টির (ট্রাই-নাইট্রো টোলুইন) শক্তির চেয়েও বেশী। ... এটি একটি পরমাণু বোমা ...পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির আধার সূর্য্য যে উৎস থেকে নিজের শক্তি সংগ্রহ করে, সেই উৎস-জাত শক্তিই প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের উপর যারা দূরপ্রাচ্যে সমরানল জ্বালিয়েছে।'

হিরোশিমা ও নাগাসাকির যুগান্তকারী ঘটনার অব্যবহিত পর থেকেই পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলিতে পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে সত্য ও মিথ্যায় মেশানো অনেক মর্ম্মান্তিক কাহিনী প্রচারিত হতে থাকে। এমন কি এখনও সেরকম কাহিনীর প্রকাশ বন্ধ হয়নি।

এ সম্বন্ধে কিছু কিছু সত্য সংবাদের সঙ্গে আবার অসত্য সংবাদও প্রচারিত

হওয়া শুরু হয়। ফলে যাঁরা পৃথিবীর লোককে পরমাণু ও তার ভবিষ্যৎ তাৎপর্য্য সম্পর্কে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করবেন তাঁরা গোড়া থেকেই বিভ্রান্ত থেকে যান।

সে সময়কার ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহে যে সকল তথ্য প্রচারিত হয়েছিল, তার অনেকগুলিই আমেরিকার আণবিক বোমা ঘটিত কার্য্যক্রমে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের অবদান সংক্রান্ত। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা প্রথমে তাঁদের নিজেদের গবেষণাগারে পরমাণু সম্বন্ধীয় প্রাথমিক গবেষণা করেন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্য হিসাবে এ বিষয়ে সাহায্য করেন। স্যার জেমস চ্যাডউইক ও অধ্যাপক রুডল্ফ পেয়িরল্স প্রভৃতি বিজ্ঞানীর অবদানের কথা বর্ণনা করা হয়। বাস্তুত্যাগী জার্মান বিজ্ঞানী অটো ফ্রিশ এবং ফরাসী বৈজ্ঞানিক হানস ফন হালবেন ও লিও কাওয়ার্স্কির কথাও উল্লেখ করা হয়। শেষোক্ত বৈজ্ঞানিকটি ফ্রান্সের পতনের পর প্রায় চল্লিশ গ্যালন 'ভারী জল' অর্থাৎ তখনকার পৃথিবীতে এই মূল্যবান্ জিনিষটির প্রায় সমগ্র সঞ্চয় নিয়ে ব্রিটেনে পালিয়ে আসেন। সে সময় বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্য ক্লাউস ফুক্সকে পারমাণবিক বোমার তথাকথিত 'গুরুত্বপূর্ণ আকার' সম্বন্ধে হিসাব নিকাশ করার জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'সেরা বিশ্বাসঘাতক'রূপে সারা পৃথিবীব্যাপী কুখ্যাতি অর্জনের পর ইনি এখন ব্রিটিশ কারাগারে আবদ্ধ আছেন।

এখনও পৃথিবীর জনসাধারণের মনে পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে যে সকল আশা, আশঙ্কা ও নৈরাশ্য বিদ্যমান, সেদিনের সংবাদপত্রসমূহে সেগুলি সমস্তই লিপিবদ্ধ হয়। অথচ আজ পর্য্যন্ত এই অভিনব শক্তি সম্বন্ধে আলোচনার ফলে কতটুকু নূতন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। যেহেতু সে সময় আমি ব্রিটেনে ছিলাম, তাই নূতন বোমা সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা আমি শুনি ও পড়ি, তা সমস্তই ব্রিটিশ জাতির। কিন্তু সেগুলিকে

শুধু ব্রিটিশ জাতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভাবলে ভুল করা হবে, সেগুলি বাস্তবিকক্ষেত্রে যেকোনও লোকেরই মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং সারা পৃথিবী জুড়েই এ প্রতিক্রিয়া একই রকম।

হিরোশিমায় বোমা ফেলার পরের দিনই লণ্ডন ক্রনিক্‌ল পত্রিকায় ব্রিটিশ সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

'বাস্তবিকপক্ষে শক্তির এই নব উৎস যে সর্বাপেক্ষা আশাপ্রদ ও আকর্ষণীয় সম্ভাবনা উপস্থাপিত করেছে তা হচ্ছে তার সৃজনাত্মক দিকের। এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা মোটেই অবিবেচনাপ্রসূত নয় যে, কালক্রমে পারমাণবিক শক্তি বৈজ্ঞানিক-ক্ষেত্রে ও আর্থনীতিকক্ষেত্রে নিজেকে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।'

ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেও এই প্রসঙ্গ প্রায় একরূপভাবেই ব্যক্ত হচ্ছিল। 'সেণ্ট লুই পোষ্ট ডিস্প্যাচের' ৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫এর সংখ্যায় রাইস ইনষ্টিট্যুটের ডাঃ এক এ উইলসন এই প্রকার মন্তব্য করেন :

'পরমাণু বিভাজন করার ধ্বংসাত্মক সত্তাটির উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা যাতে ভুল লোকের হাতে গিয়ে না পড়ে তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের হাতে পৃথিবীর সমস্ত ইউরেনিয়ম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকা উচিত।' পত্রিকাটির ঐ সংখ্যাতেই নিম্নলিখিতরূপ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় :

'পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মানব জাতির ভবিষ্যৎ পুরুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কতদূর প্রসার হবে, তার একটা আঁচ করার জন্য আজ কল্পনা শক্তিকে বহুদূর নিয়ে যাওয়া দরকার…এটা ঠিক যে সেই অবস্থায় পৌছুতে বহু মানুষের কঠোর শ্রমের প্রয়োজন হবে…হয় মর্ত্যবাসী মানুষ—যাদের মধ্যে আমরাও আছি—এই নূতন শক্তিকে যুদ্ধের বদলে শান্তির জন্য ব্যবহার করবে, নয় বুঝতে হবে যে, বিজ্ঞান পৃথিবীর সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে ধরিত্রীর ধ্বংসস্তূপকে পিপীলিকাদের হাতে সমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছে।'

নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌ বলেন : 'নিউ মেক্সিকোর আলামাগর্ডো বিমানক্ষেত্রে নূতন বোমার যে পরীক্ষা হয়েছে এবং হিরোশিমায় যা সমরোপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা' যে শক্তির বিকাশের সূচনা করেছে তা হয়ত শিল্প ও পরিবহণের অগণিতক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধন করবে এবং ফলে মানব সভ্যতার আমূল রূপান্তর ঘটবে। পারমাণবিক বোমায় যে ধ্বংসলীলা প্রকট হয়েছে, তা এক ভয়ঙ্করী সম্ভাবনার দ্যোতক, তাই এরূপ কল্পনা করা কঠিন যে পৃথিবীর কোন জাতি আবার কোন সময়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবে···যুদ্ধের প্রধান প্রধান সমস্ত কারণ হ্রাস করা এবং সম্ভবস্থলে সেগুলি দূর করার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে অবশ্যই নিয়মিতভাবে চেষ্টা শুরু করতে হবে।'

ঐ টাইম্‌স্‌ পত্রিকাতেই আবার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডেভিড সারনফের একটি অত্যন্ত বাস্তব ও কার্য্যোপযোগী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন যে, 'যতদিন না এমন কোন বিশ্ব প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় বাস্তবিকই সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে, ততদিন আমরা জাতীয় রক্ষা প্রচেষ্টায় কোনরূপে শিথিলতা দেখাতে পারি না।'

এইভাবে, গর্ব্ব ও বিনয়, আশা ও আশঙ্কা, সন্দেহ ও বিশ্বাসে ভরা মন নিয়ে মানুষ পারমাণবিক যুগের সিংহদ্বার অতিক্রম করল। নানা প্রকারের ভাব, বিচিত্র প্রতিক্রিয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা, এমন সব সমস্যা উপস্থিত হ'ল, যার সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই। যুদ্ধ থেমে গেল কিন্তু তার ভয়াবহ উত্তর-পুরুষ থেকে গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে সৈন্যদলকে ভেঙ্গে দেওয়া যায় কিন্তু বোমা তৈরী বন্ধ করা যায় না। তবুও সমস্যার সমাধান করতেই হবে ; সমস্ত প্রশ্নকে ছাপিয়ে একটিমাত্র প্রশ্ন সকলের মনে বিরাজ করতে লাগল, যা 'লণ্ডন অবজারভার' সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে প্রকাশ করল, 'অতঃ কিম্‌?'

প্রশ্নটি যদিও সারা পৃথিবীর, তবু ইহা প্রধানতঃ একটি জাতিরই, সে জাতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। কেননা যুক্তরাষ্ট্রই এই বোমার উদ্ভাবন করেছে, যুক্তরাষ্ট্রই

ইহার প্রয়োগ করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রই ইহার একমাত্র অধিকারী। কাজেই বিশ্ববাসী যুক্তরাষ্ট্রকেই জিজ্ঞাসা করে যে, বোমা দিয়ে তারা কি করতে চায়। ভবিষ্যতে পরমাণু নিয়ে আমেরিকা কোন্ পথ অবলম্বন করবে?

এই প্রথম যে এ প্রশ্ন উঠেছে তা নয়। গবেষণাগারে যখন থেকে প্রতিভাত হতে লাগল যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ অজস্র শক্তি মানব দ্বারা মুক্ত হবে, তখন থেকেই প্রশ্নটি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মহলের অভ্যন্তরে বহুবার জিজ্ঞাসিত হয়েছে। এমনকি বিশ্বের অগোচরে ১৯৪৫ সালের মে মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের সমরসচিব ষ্টিমসন—যাঁর দফ্তরের কর্তৃত্বাধীনে যুদ্ধকালীন বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা হয়—বিশিষ্ট রাজপুরুষ ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন, যার আলোচ্য বিষয় ছিল পৃথিবীর ও যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মূলনীতি নির্দ্ধারণ করা। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের অনুরোধে গঠিত এই কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন হেনরী ষ্টিমসন, জেমস্ এফ বার্ণস, ভ্যানেভার বুশ, কার্ল টি কম্‌টন, এবং জেমস্ বি কোনান্ট প্রভৃতি। তাছাড়া এঁরা ওপেন-হাইমার, আর্ণেষ্ট লরেন্স, আর্থার কম্‌টন এবং এনরিকো ফের্মি প্রমুখ বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানীদের দ্বারা গঠিত পরামর্শ সভার সাহায্য পান।

কতকটা এই কমিটির শ্রমের দ্বারা, কতকটা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ও বৈজ্ঞানিক নেতাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মননের দ্বারা, সাধারণ্যে আণবিক শক্তির প্রকাশের আগেই যুক্তরাষ্ট্র কতকগুলি বাস্তব মীমাংসায় উপনীত হয়, যার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ নীতি গঠিত হতে পারে।

মীমাংসাগুলি কতকটা এইরূপ :—

১। পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত তথ্যগুলি যত যত্নেই না গোপন রাখা হউক, এক সময় না এক সময় আমেরিকার বাইরে সেগুলি জানা যাবে।

২। পারমাণবিক শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে কোন এক জায়গায় শান্তিপূর্ণ

ব্যবহারের এমন আভাস আছে যার দ্বারা আমেরিকা তথা সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণের মহতী উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

৩। হিতাহিত দুইদিকেই যে পরমাণুর অপূর্ব্ব ও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার এমন বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে হিতের প্রসার হয় ও অহিতকে দমন করা যায়।

৪। পারমাণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দেশের মধ্যেই হউক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই হউক খুব সত্বর করা প্রয়োজন।

৫। যতদিন পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কার্য্যকরী ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

আমি যতদূর জানতে পেরেছি, কোনও সময় কোনও দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এমন কথা বলেন নাই 'বোমা যেমন আমাদের আছে আর কারও নেই, তখন চল আমরা পৃথিবীটা জয় করে আসি।' যুক্তরাষ্ট্র কখনও এরকম চিন্তা মনে স্থান দেয় না এবং বিগত মহাযুদ্ধের শেষেও এরকম চিন্তা করে নাই।

সমরসচিব দ্বারা গঠিত কমিটিতে বিধিবদ্ধভাবে এবং সরকারী ও বিজ্ঞানী মহলে ঘরোয়াভাবে এই সকল চিন্তা পূর্ব্বেই হয়েছিল বলে প্রেসিডেণ্ট টুম্যান হিরোশিমা সংক্রান্ত প্রথম ঘোষণাতেই বলতে পেরেছিলেন, 'আমি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে অনুরোধ করব যে তাঁরা যেন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক শক্তির মুক্তি ও ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য একটি উপযুক্ত কমিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। আমি এ সম্বন্ধে আরও চিন্তা করে কংগ্রেসের কাছে পরে প্রস্তাব আনব যাতে পারমাণবিক শক্তি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোরের সঙ্গে নিজ প্রভাব খাটাতে পারে।'

পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা এভাবে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল: (১) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরমাণু নিয়ন্ত্রণের

কার্য্যকরী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ; (২) পরমাণুকে সমগ্র বিশ্বে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা ; (৩) আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পাকা না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকার একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা এবং ইতিমধ্যে পরমাণুকে আক্রমণ বা জাতীয় সম্প্রসারণের অস্ত্ররূপে ব্যবহার না করে বিশ্বশান্তি এবং মানবকল্যাণে নিয়োজিত করা। এই মহৎ উদ্দেশ্যসকল কি রূপ পরিগ্রহ করে তা দেখবার জন্য বিশ্ববাসী কিছুদিনের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

প্রেসিডেন্ট ৩রা অক্টোবর পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে তাঁর সুপারিশসমূহ কংগ্রেসের নিকট পেশ করলেন :—

'মানবসমাজ ইতিহাসে কখনও এরূপ ভয়াল বিভীষিকার দ্যোতক অথচ বিশ্বশান্তি ও মানবের ভবিষ্যতের এত উজ্জ্বল আভাসপ্রদানকারী শক্তির সম্মুখীন হয়নি। আমার আশা, যখন আমি বলছি যে এই নবলব্ধ জ্ঞানকে আমরা ব্যবহার করব ভবিষ্যৎ পুরুষের কল্যাণের জন্যই, ধ্বংসের জন্য নয়, তখন আমি আমেরিকান জনসাধারণের বিশ্বাসকেই ধ্বনিত করছি।

'এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদিগকে দুই দিকে চেষ্টা করতে হবে দেশের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

'এর মধ্যে প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী ব্যবস্থা করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের।'

এইভাবে উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন, 'একটি পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠিত করতে যার সদস্যগিকে তিনি সেনেটের সম্মতিক্রমে মনোনীত করবেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, তখনকার সমগ্র কার্যসূচী এই কমিশনের হস্তে অর্পণ করা হোক এবং তার উপর ভার দেওয়া হোক পারমাণবিক শক্তিকে আরও বিকশিত করে সামরিক, শিল্প, বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যবহারে যাবতীয় গবেষণা পরীক্ষা ও প্রয়োগ করার।' তিনি আরও প্রস্তাব করেন, 'যে কমিশনের অনুমোদিত সর্ত্তে ছাড়া অন্য ভাবে

পারমাণবিক শক্তির উৎস পদার্থটি উৎপাদন ও ব্যবহার, আমদানী অথবা রপ্তানী বেআইনী বলে ঘোষণা করা হোক।' প্রেসিডেণ্ট স্বীকার করেন যে তাঁর প্রস্তাবগুলি খুব কঠিন ও সুদূরপ্রসারী, কিন্তু তিনি দেখিয়ে দেন, 'যে আবিষ্কার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা প্রকৃতির এমন শক্তি যা আমাদের সাধারণ নিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না।'

পৃথিবীর অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'মানব সভ্যতার একমাত্র আশা, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় পারমাণবিক বোমার ব্যবহার একেবারে রদ করে পারমাণবিক শক্তিকে এবং তৎসংক্রান্ত ভবিষ্যতে লভ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীকে শান্তি ও কল্যাণের পথে চালিত করা···অতএব আমি চেষ্টা করব প্রথমতঃ এই আবিষ্কারে আমাদের সহকর্মী গ্রেট ব্রিটেন ও কানাডা এবং পরে অন্যান্য জাতি-সমূহের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করতে, যাতে করে পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা করার শর্তগুলি সম্বন্ধে একমত হতে পারি। অবশ্য এই রকম বন্দোবস্ত করা খুবই কঠিন।' তিনি সে সময় একথাও বলতে পারতেন যে দেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও খুব সহজ নয়।

যেদিন প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসের কাছে এই বাণী প্রেরণ করেন সেইদিনই স্বরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সরকারী বিল কংগ্রেসের দুই সভাতেই উত্থাপন করা হয়। আমেরিকান প্রথা অনুযায়ী বিলের প্রস্তাবকদের (সেনেটে সেনেটর জনসন এবং প্রতিনিধিসভায় এনদ্রা মে) নাম অনুসারে এর নাম হয় মে-জনসন বিল। এর ধারা অনুযায়ী একটি অস্থায়ী পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠনের প্রস্তাব ছিল, যাতে কর্ম্মরত সমর ও নৌ-বিভাগীয় অফিসারেরা কার্য্যে নিযুক্ত হতে পারতেন। কমিশনের হাতে প্রভূত ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল।

বিলটি প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসে এবং দেশে বহুস্থানেই আপত্তি উঠল যে, প্রস্তাবিত কমিশনে সৈনিকদিগের অযথা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আপত্তিকারীদের মধ্যে অনেকে শক্তিশালী ছিলেন, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় যে

সকল বিজ্ঞানী পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করতে সহজ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন। তর্কাতর্কির ফলে মে-জনসন বিলটি লোকের মনে পারমাণবিক শক্তির সামরিক নিয়ন্ত্রণের প্রতীক বলে বোধ হতে লাগল।

মে-জনসন বিল সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসার জন্য সেনেট অক্টোবর মাসের ২৯শে তারিখে পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করেন। সেনেটর ম্যাকম্যাহন হলেন তার সভাপতি, উদ্দেশ্য পারমাণবিক শক্তির বিকাশ, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পূর্ণ এবং বিরামহীন অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষন। কমিটি পরের মাসে শুনানী শুরু করে এবং ২০শে ডিসেম্বর সেনেটর ম্যাকম্যাহন তাঁর দ্বিতীয় বিল উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবিত বিলের ভিত্তিতেই পরবর্তী শুনানীসমূহ পরের বছর এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। বিলে প্রস্তাব থাকে একটি স্থায়ী কমিশন যার সদস্যদের অনুরূপ কোন সামরিক বা ব্যবসা সংক্রান্ত স্বার্থ থাকতে পারবে না। বিলে কিভাবে কমিশন তার অতুল শক্তি ব্যবহার করবে তা বিশদভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং পারমাণবিক শক্তিকে একচেটিয়া সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। মে-জনসন বিলকে যেমন সামরিক নিয়ন্ত্রণের প্রতীক বলে মনে হয়েছিল, ম্যাকম্যাহন বিল তেমনি অসামরিক নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হয়ে উঠেছিল এবং বিজ্ঞানী ও প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান একে আদর্শ বলে মেনে নিয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ম্যাকম্যাহনকে চিঠি লেখেন তাঁর বিলকে আইনে পরিণত করার কথা উত্থাপন করে।

১৯৪৬ সালের বসন্ত কাল পর্যন্ত যেসব আন্দোলন আলোচনা হ'ল তাতে বোঝা গেল যে অধিকাংশ দেশবাসী তিনটি বিষয়ে একমত: প্রথমতঃ, পরমাণু সরকার দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত; দ্বিতীয়তঃ, নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অসামরিক লোকের হাতে থাকা উচিত এবং তৃতীয়তঃ, এর বিকাশ সম্বন্ধে সামরিক কর্তৃপক্ষের পরামর্শ দিবার অধিকার থাকবে যতক্ষণ না সে পরামর্শ

নিয়ন্ত্রণের নামান্তর হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের ঠিক কতখানি অধিকার এই নিয়ে আরও কিছুদিন তর্কবিতর্ক চলবার পর এবং সামরিক ও অসামরিক উভয় পক্ষের মধ্যে খানিকটা রফা নিষ্পত্তির পর ম্যাকম্যাহন বিলটি জুলাই মাসে কংগ্রেসের উভয় সংসদে পাস হয়ে ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত হ'ল।

এই আইন অনুযায়ী পাঁচজন সদস্য নিয়ে একটি পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠিত হ'ল। সেনেটের পরামর্শ ও সম্মতি নিয়ে প্রেসিডেন্ট এর সদস্যগণকে নিয়োগ করতে পারবেন। সদস্যগণ আর কোনরূপ ব্যবসায় বা পেশাতে লিপ্ত থাকতে পারবেন না। কমিশনের হাতে প্রচুর ক্ষমতা অর্পিত হ'ল এবং ক্ষমতাগুলি ব্যবহারের জন্য কমিশনের উপর নির্দ্দেশ রইল। যেমন, যে সমস্ত পদার্থ থেকে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ সম্ভব কমিশনকে তার স্বত্বাধিকারী করে দেওয়া হ'ল। ঐ সমস্ত বস্তু যে সকল কলকারখানায় প্রস্তুত হতে পারে এবং ঐ সংক্রান্ত নব আবিষ্কারের যা কিছু পেটেন্ট সে সকলেরই অধিকারী হলেন কমিশন। তা'ছাড়া কমিশনের উপর আইনের নির্দ্দেশ রইল যে, পারমাণবিক পদার্থগুলি যে সমস্ত খনিজ পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয় সেগুলিকে লাইসেন্স ও উপবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে। শুধু তাই নয় পরমাণু সংক্রান্ত সমুদয় সংবাদ বিনিময়কেও নিয়ন্ত্রণ করার ভার তাঁদের উপর রইল। পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে ব্যাপক ও বিস্তৃত গবেষণা করবার জন্য ও প্রেসিডেন্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করবারও নির্দ্দেশ রইল। কমিশনের মন্ত্রগুপ্তির সহায়তার জন্য আইনের মধ্যে কঠোর দণ্ডবিধির ব্যবস্থা রইল। কোন কোন ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গকারীর প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হবার ব্যবস্থা আছে। আর এই আইনের দ্বারাই পরমাণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও কানাডার সঙ্গে সহ-যোগিতা বর্জ্জনের নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল।

কমিশনকে তাদের বিরাট ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের সহায়ক হিসেবে আইনটির

মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু সম্পর্কিত ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হ'ল। যথা, 'যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের ঘোষিত নীতি এই হ'ল যে, সকলের ধন-প্রাণ রক্ষার চরম উদ্দেশ্য বজায় রেখে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ ও ব্যবহারকে চালিত করতে হবে যতদূর সম্ভব জনকল্যাণের উন্নতির জন্য, জীবনমান উন্নয়নের জন্য, বেসরকারী ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাকে দৃঢ়ীভূত করার জন্য ও বিশ্বশান্তি পাকা করার জন্য।'

কমিশন যাতে তাঁদের অগাধ ক্ষমতা যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাতে উৎসাহ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য, আইনে একটি কংগ্রেসী কমিটিও স্থাপিত হ'ল, ন'জন সেনেটর ও প্রতিনিধি সভার ন'জন সদস্য নিয়ে। এঁদের কাছে সকল প্রকার খবর দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ রইল। এ ছাড়া আইনে প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক কমিশনকে বৈজ্ঞানিক ও কলাকুশলে উপদেশ দেবার জন্য অসামরিক নাগরিকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত একটি সাধারণ পরমর্শদাতা কমিটি আর সামরিক বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য একটি সামরিক মধ্যস্থ কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। সামরিক মধ্যস্থ কমিটি সমর সচিব দ্বারা নিযুক্ত হবেন ও স্থল, নৌ ও বিমান বিভাগের দু' দু' জন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হবেন। ইহাদের সভাপতি হয় সামরিক কর্ম্মচারী অথবা বেসামরিক ব্যক্তি ঐ ছ'জনের উপর নিযুক্ত হবেন। আইনের নির্দ্দেশ রইল যে, কমিশন পারমাণবিক শক্তির যে সকল বিকাশের সামরিক সম্ভাবনা আছে বলে মনে করবেন সে সম্বন্ধে সর্ব্বদা সামরিক কমিটির সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করবেন এবং কমিটিকে ঐ সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ সরবরাহ করবেন। কমিটিও সামরিক বিভাগের পারমাণবিক গবেষণাগুলি কমিশনকে জানাবেন। কমিটি লিখিতভাবে কমিশনকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকারী রইলেন এবং এক মত না হলে সমর সচিবের মারফৎ প্রেসিডেন্টের কাছে আপীল করতে পারবেন। এই হ'ল স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা। ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি নীতি নির্দ্ধারিত হয়ে গেল,

বাকী রইল শুধু সদস্যগণকে নিয়োগ করা ও তাঁদের হাতে সম্পত্তিগুলি তুলে দেওয়া।

ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে পররাষ্ট্রনীতিও প্রায় নির্দ্ধারিত হয়ে এসেছিল।

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি রাষ্ট্রসঙ্ঘ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ব্রিটেনের প্রস্তাবক্রমে একটি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠন করেন। রাশিয়া, চীন এবং ফ্রান্সও তার সদস্য নিযুক্ত হন। নিয়ন্ত্রণের একটি প্রস্তাবও আমেরিকা এই কমিশনের কাছে উত্থাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক পরিকল্পনার মত মোটামুটি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি 'আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি বিকাশ সংস্থা' সৃষ্টি করবার কথা ওঠে। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা পারমাণবিক শক্তির সমস্ত বিপজ্জনক বিকাশকে সরাসরিভাবে তত্ত্বাবধান করবেন, শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করবেন ও সমস্ত অসামরিক প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন —এই প্রকার পরিকল্পনা করা হয়। জাতীয় সরকারগুলি নিজ নিজ দেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার অজ্ঞাতে অননুমোদিত কোন কার্য করেন কিনা তা পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য একটি পর্য্যবেক্ষক দল ও সেই দলের নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করার মত যথেষ্ট ক্ষমতার ব্যবস্থা করার কথাও পরিকল্পনায় থাকে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা হলে যুক্তরাষ্ট্র নিজ পারমাণবিক বোমাগুলির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে, সামরিক ক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ প্রয়োগ বন্ধ করতে ও আন্তর্জাতিক সংস্থাটিকে পারমাণবিক সমস্ত জ্ঞান অর্পণ করতে রাজী হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগে এই পরিকল্পনার গোড়াপত্তন করা হয় ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে একটি কমিটিতে। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার-সেক্রেটারী ডিন এচেসন এবং সদস্য ছিলেন ভ্যানেভার বুশ, জেমস্ কোনান্ট, জেনারেল লেস্‌লি, আর গ্রোভস্

এবং জন জে ম্যাক্‌লয়। একটি পরমর্শ সভা কমিটিকে সাহায্য করে। এই পরামর্শ সভার সভাপতি ছিলেন ডেভিড ই লিলিয়েন্‌থাল এবং সদস্য ছিলেন চেষ্টার এ বার্ণার্ড, জে রবার্ট ওপেনহাইমার, চার্লস এলেন টমাস এবং হ্যারী এ উইন। মার্চ্চ মাসে কমিটির প্রকাশিত বিবরণী এচেসন-লিলিয়েন্‌থাল রিপোর্ট নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৬ সালের ১৭ই জুন যুক্তরাষ্ট্রে। প্রতিনিধি বার্ণার্ড বারুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের কাছে যে মার্কিন প্রস্তাব পেশ করেন, সে প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল এই কমিটির বিবরণী। প্রস্তাব পেশ করবার সময় মিঃ বারুক তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা এই বলে সুরু করেন, 'আমরা এখানে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বেছে নিতে এসেছি।'

সমস্ত বিশ্বই জানে যে এই প্রস্তাব বা এই ধরণের পরবর্ত্তী অন্য কোন প্রস্তাবই কার্য্যকরী করা হয়নি। (ছ'মাস পরে প্রায় অনুরূপ আর একটি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করা হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিক সংখ্যক জাতির প্রস্তাব হিসেবে।) রাশিয়ানরা বা তার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রসঙ্ঘের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অধিক সংখ্যক জাতির সঙ্গে একমত হতে পারেনি। তাঁরা বলেন যে, এইরূপ পরিকল্পনা জাতিসকলের সার্ব্বভৌম অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করবে। তাঁরা বলেন যে, সমস্ত পারমাণবিক শস্ত্রগুলি প্রথমে বিনষ্ট করা হোক এবং যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হোক, তবেই পারমাণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা আলোচিত হতে পারে। অধিকাংশ জাতিই কিন্তু এই প্রস্তাবগুলিকে কতকটা অবাস্তব বলে বর্জ্জন করেছে, কেননা তাঁদের মতে এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে কোন জাতি দ্বারা গোপনে অপরিমিত পরিমাণে পারমাণবিক বোমা সংগ্রহ করার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেই।

১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে নবগঠিত কমিশন যুক্তরাষ্ট্রের মানহাট্টান ডিষ্ট্রিক্টের (মার্কিণ সামরিক বাহিনীর একটি যুদ্ধকালীন গুপ্ত বিভাগ)

নিকট হতে পারমাণবিক শক্তি বিকাশের কার্যাসূচী গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কমিশনের অধিকারভুক্ত হ'ল :—

(১) নিউ মেক্সিকোর লস্ আলামসে ১৪০ কোটি ডলার ব্যয়ে স্থাপিত অস্ত্র-গবেষণাগার ও তৎসংশ্লিষ্ট ন'হাজার অধিবাসীসহ একটি শহর ; টেনেসীর ওকরিজে ছাপ্পান্ন হাজার অধিবাসীর একটি শহর ও সেখানকার সরকারী কারখানা ও গবেষণাগার ; ওয়াশিংটনে সতেরো হাজার অধিবাসীর হ্যানফোর্ড শহর ও সেখানকার কারখানা, শিকাগো শহরে স্থাপিত একটি অস্থায়ী গবেষণাগার ; ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে শহরে স্থাপিত রশ্মি গবেষণাগারের কয়েকটি মূল্যবান যন্ত্রপাতি এবং নিউইয়র্ক প্রদেশের ব্রুকহ্যাভেন, লং আইল্যাণ্ড ও সেনেকটাডি এবং ওহায়ো প্রদেশের মিয়ামিসবার্গে নির্ম্মীয়মান গবেষণাগারগুলি।

(২) এটি এমন এক কার্যাসূচী যাতে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীনে পাঁচহাজার সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারী এবং ঠিকাদারদের নিযুক্ত পঞ্চাশ হাজার কর্ম্মচারী কাজ করছিল।

(৩) এমন এক পদ্ধতি যাতে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কাজ ও শ্রমশিল্পের কাজ বেসরকারী ঠিকাদারদের মারফতে করানো হচ্ছিল। কয়েকশত গবেষণা সহায়ক ঠিকাদার, গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক শ্রমশিল্পের কয়েক কুড়ি ঠিকাদার, কয়েক হাজার জোগানদার, বিশেষ কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং নানান রকমের কাজের জন্য নিযুক্ত সহকারী ঠিকাদার বা সাব-কণ্টাক্টর তখন কাজ করছিল।

(৪) বোমা তৈরী করার কৌশল।

নূতন কমিশন উপরিউক্ত তিন ধারায় উল্লিখিত প্রথা বজায় রাখতে সিদ্ধান্ত করলেন। তাতে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল : প্রথম, আমেরিকার শিল্প ও বিজ্ঞানের ব্যবস্থা ও প্রয়োগ-কৌশল কমিশনের পক্ষে অনায়াসলব্ধ হ'ল, দ্বিতীয়, সরাসরি নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যার স্ফীতি নিবারণ করা সম্ভব

হ'ল। বর্ত্তমানে কর্ম্মসূচী ১৯৪৭ সালের কর্ম্মসূচীর বহুগুণ হয়েছে, কিন্তু সরাসরি সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার হতে সাত হাজারে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে কিন্তু ঠিকাদারদের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫০,০০০ থেকে প্রায় ২০০,০০০এ দাড়িয়েছে।

কমিশনটি বেসরকারী যৌথ কর্পোরেশনের মত গঠিত। একেবারে শিখরে পাঁচজন কমিশনার বা কমিশনের সদস্য—যাঁরা নীতি স্থির করেন। তাঁদের নীচেই জেনারেল ম্যানেজার। পূর্ব্বে জেনারেল ম্যানেজার প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হতেন। এখন কিন্তু তিনি কমিশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন এবং কমিশনের কাছেই দায়ী থাকেন। জেনারেল ম্যানেজারের নীচে অনেকগুলি কার্য্যকরী বিভাগ আছে—যেমন, সামরিক ব্যবহার, উৎপাদন, গবেষণা, পারমাণবিক চুল্লী বা রি-অ্যাক্টরের উন্নয়ন, শরীরতত্ত্ব, চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা। কমিশনের সঙ্গে ঠিকাদারদের যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হয় ওকরিজ, হ্যামফোর্ড, নিউইয়র্ক, শিকাগো, আলবুকের্ক প্রভৃতি যে যে স্থানে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলে থাকে, সেখানকার দপ্তরসমূহের মধ্য দিয়ে।

কমিশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন ডেভিড ই লিলিয়েন্থাল। ইনি পূর্ব্বে 'টেনেসী ভ্যালী অথরিটি' নামক সংস্থাটির সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরমাণু শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের ভিত্তিরূপে গৃহীত এচেসন-লিলিয়েন্থাল রিপোর্টের অন্যতম রচয়িতা ছিলেন। তিনি ১৯৫০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ করেন। তারপর বর্ত্তমান লেখক ১৯৫০ সালের ১১ই জুলাই থেকে ১৯৫৩ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সভাপতি থাকেন। মধ্যবর্ত্তী সময়ে এস টি পাইক অস্থায়িভাবে সভাপতির কাজ করেন। সর্ব্বপ্রথমে মিঃ পাইক ছাড়া, রিয়ার অ্যাডমিরাল এল ষ্ট্রাউস, বিজ্ঞানী রবার্ট ব্যাচার ও আইওয়া রাজ্যের প্রকাশক উইলিয়াম্ ওয়েম্যাক কমিশনের সদস্য ছিলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের সদস্যপদেও পরিবর্ত্তন হয়েছে। ১৯৫৩

সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিশনের সদস্যপদে ছিলেন পারমাণবিক বিজ্ঞানী হেনরী ডি উলফ স্মিথ, নিউ ইয়র্কের ব্যবসায়ী ও ইঞ্জিনিয়ার টমাস বি মারে, ভূতপূর্ব বিমানবহরের সহকারী সচিব ইউজেন এম জুকার্ট, ওহায়োর শিক্ষাবিদ ও ইঞ্জিনিয়ার টি কীন গ্লেনান। মিঃ গ্লেনান ১৯৫২ সালের ১লা নভেম্বর পদত্যাগ করেন। অন্যরা এখনও কমিশনের সদস্য আছেন।

কমিশন যে ছ'বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার অধিকাংশ সময়ই কংগ্রেসের পরমাণুশক্তি সংক্রান্ত সংযুক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন পরলোকগত সেনেটর ব্রিয়েন ম্যাকম্যাহন এবং সাধারণ পরামর্শদাতা কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ জে. রাবার্ট ওপেনহাইমার, যাঁকে পারমাণবিক বোমা নির্ম্মাণের জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব দেওয়া হয়। এঁরাই আমেরিকার বর্ত্তমান পারমাণবিক কার্য্যসূচীকে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পারমাণবিক অস্ত্র

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের তৎপরতার অঙ্গস্বরূপ সুদূরবর্ত্তী খনিজ পদার্থের যাঁরা অনুসন্ধান করছেন তাঁদের দুর্গম খনির, কিম্ভূতকিমাকার কারখানার এবং কর্ম্মীদের অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মতৎপরতার অন্তরালে রয়েছে আমাদের জাতীয় পারমাণবিক শস্ত্রাগার। এই সমস্ত কর্ম্ম-ব্যস্ততার নির্দ্দিষ্ট পরিণতি সেই

অস্ত্রগুলির মধ্যে। তাদের অতি গোপন আধারে বিশ্রামকারী এই অস্ত্রগুলি শুধু যে আমেরিকাবাসী মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করছে তা নয়, তারা জাগতিক ঘটনাবলীকেও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে।

পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত যত আলোচনা শোনা যায়, তার বেশীর ভাগই পারমাণবিক শস্ত্ররাজি সম্বন্ধে। অথচ পারমাণবিক অস্ত্রগুলি কি, তাদের দৌড় কতদূর, আর তারা আমাদের কিভাবে প্রভাবান্বিত করবে, এ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে সত্যকারের জ্ঞান পারমাণবিক কার্য্যসূচীর অন্য অংশগুলির অপেক্ষা অনেক কম। আলোচনাগুলির বড় বেশী অংশ অজ্ঞতাজনিত, অনেকগুলি কল্পনা-প্রসূত, আর একটা বৃহৎ অংশ বিভীষিকা সৃষ্টি করার জন্যই। এজন্য এই সকল আলোচনা থেকে পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা যায় না।

পারমাণবিক কর্ম্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, এমন অনেকে আবিষ্কার করেছেন যে, পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে সাধারণের কাছে আলোচনা করলে খবরের কাগজের শীর্ষদেশে নাম ওঠে ও এক প্রকারের খ্যাতি অর্জ্জন করা যায়। এই বিষয়ের বিভ্রান্তকারী আলোচনাগুলির মূল আমার মতে এইখানে। যেখানে সরকার নিরাপত্তার খাতিরে কিছু প্রকাশ করতে চান না, সেখানে তথাকথিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুযোগ বেশী। এই ভদ্রলোকেরা যা বলেন তার মাত্র খানিকটা সত্য। অবশ্য নিরাপত্তার দিক দিয়ে এ ভালোই, কেননা এ সকল আলোচনাদ্বারা হয়ত আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বিভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের জনসাধারণও সমানভাবে বিভ্রান্ত হয়। অথচ সরকারের পক্ষে তাঁদের এই সমস্ত লেখা বা বক্তৃতার উপর নিয়ন্ত্রণ বসানো সহজ নয়, কেননা তা'হলে কোথায় তাঁদের ভ্রান্তি তা দেখিয়ে দিতে হয়—অর্থাৎ আসল তথ্যগুলি ব্যক্ত করতে হয়। তারপর তাঁরা যথাসময়ে 'আর কারুকে বলা নিষেধ' ইত্যাদি নির্দ্দেশ দিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাগুলি প্রচার

করতে থাকবেন, এমন কি খবরের কাগজে প্রকাশ করে দেওয়াও আশ্চর্য্য নয়। সরকারীভাবে তাঁদের উক্তিগুলির প্রতিবাদ করা একই কারণে সম্ভব নয়, কেননা কতটুকু মিথ্যা তা বলতে গেলেই খানিকটা সত্যের আভাস দিতে হয়। সরকারীভাবে এসব আলোচনা বন্ধ করতে যাওয়ার বিপদ এই যে কোন্ কোন্ আলোচনা সত্যসত্যই বিভ্রান্তিকর আর কোন্গুলি নয়, তা নির্দ্ধারণ করার ভার সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর দিলে, তাঁরা নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সব আলোচনাই বন্ধ করার পক্ষপাতী হয়ে পড়তে পারেন। হিটলারের রাজত্বে যে সকল বই 'বিভ্রান্তকর' বলে নিষিদ্ধ হয়েছিল তাদের সংখ্যা বিপুল।

অবশ্য পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে জনসাধারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পায়নি, কাজেই ভুল বোঝার সুযোগ যথেষ্ট। সৌভাগ্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি এই ধরণের বোমার বিস্ফোরণ হয়েছে, তা হয়েছে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে। জগতের বিভিন্ন স্থানে যে ৪৯টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৬টিতে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক কর্ম্মচারী বা ঐ সকল রাষ্ট্রের পারমাণবিক কর্ম্মসূচী সম্পর্কিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোকেরা দেখবার ও অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছে। এই প্রবন্ধ লেখার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে তার সময়-সূচী নীচে দেওয়া হ'ল :—

১৯৪৫ সাল—যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক মোট তিনটি : আলামাগার্ডো, হিরোসিমা ও নাগাসাকি।

১৯৪৬ " —যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক মোট দু'টি : প্রশান্ত মহাসাগরে বিকিনি প্রবাল দ্বীপপুঞ্জে।

১৯৪৭ " —একটিও না।

১৯৪৮ " —যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক মোট তিনটি : প্রশান্ত মহাসাগরের এনিওয়েটক দ্বীপপুঞ্জে।

১৯৪৯ —রাশিয়া কর্ত্তৃক মোট একটি : সোভিয়েট রাষ্ট্রের কোন এক স্থানে।

১৯৫০ —একটিও না।

১৯৫১ —মোট ১৮টি : যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক নেভাডায় ১২টি, এনিওয়েটকে ৪টি, আর রাশিয়া কর্ত্তৃক ২টি।

১৯৫২ „ —মোট অন্ততঃ ১১টি : যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক নেভাডায় ৬টি, এনিওয়েটক দ্বীপপুঞ্জে অন্ততঃ ২টি (আসল সংখ্যা অপ্রকাশ্য), রাশিয়া কর্ত্তৃক ২টি।

১৯৫৩ „ —১লা জুলাই পর্য্যন্ত মোট ১১টি : সকলগুলিই যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক নেভাডায়।

এতগুলি বিস্ফোরণের মধ্যে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ১৯৪৫ সালে ২টি, বিকিনিতে ১৯৪৬ সালে ২টি এবং নেভাডায় ১৯৫২ সালে ১টি আর ১৯৫৩ সালে একটি, মাত্র এই ক'টি বিস্ফোরণের ব্যাপার বেসরকারী লোক কাছ থেকে দেখবার স্বযোগ পেয়েছিল। এই সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করা কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতের প্রকাশ্য পরীক্ষাগুলির সংখ্যা আরও বাড়বে আশা করা যায় ও তা বাঞ্ছনীয়।

পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে লোকে যে এত কম জানে তার প্রধান কারণ এই যে, এই সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয় একান্ত গোপনীয়তার মধ্যে, আর বিশ্বমানবের সম্মুখে তার প্রথম প্রকাশ অত্যন্ত চাঞ্চল্যময় ও ভয়ঙ্কর হিংসাত্মকভাবে। এইজন্যই অনেক লোকেই হয় পারমাণবিক অস্ত্রের গোপনতার জন্য এটিকে আলোচনার বিষয় নয় বলেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, আর নয়ত তাকে বিভীষিকাময়ী বলে ঐ সম্বন্ধে চিন্তাই করতে চান না। কাজেই সরকার যে সমস্ত তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করেন, তাদের সম্বন্ধেও তাঁদের মনের দ্বার রুদ্ধ থাকে। অনেকে আবার

হিরোসিমার কথা স্মরণ করে সকল রকম চাঞ্চল্যকর বিবৃতিই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত থাকেন, কোন্ উৎস থেকে আসল তা বিচার করেন না। কাজেই সরকারী তথ্যগুলি গুজব ও কাল্পনিক বিতর্কের সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

এ সম্বন্ধে একটু ইতিহাসের চর্চ্চা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দু'টি মাত্র পারমাণবিক বোমা সমরাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে; সেগুলি সামরিক বাহিনীর সহায়রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি, প্রতিপক্ষের যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী উদ্যোগ ধ্বংস করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ঐ দু'টি যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সেগুলিকে এমন বিমান থেকে বর্ষণ করা হয়েছিল, যে-বিমানকে আক্রমণ করা শত্রুর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এ ছাড়া প্রতিপক্ষের উহার প্রতি-শোধ স্বরূপ আমাদের দেশকে অনুরূপ অস্ত্রদ্বারা বা আর কোন কার্য্যকরীরূপে আক্রমণ করা অসম্ভব বলে জানা ছিল।

এই বোমাগুলির ব্যবহারের ফলে দু'টি মাঝারি গোছের জাপানী শহর ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় এক লক্ষ লোক হতাহত হয় এবং দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ছ'দিনের মধ্যে জাপানী জাতি আত্মসমর্পণ করে। শেষোক্ত ঘটনা দু'টির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলে সাধারণ লোকেরা মনে করেন। যাঁরা এই ধারণাকে সত্য বলে মানেন, আমিও তাঁদের একজন। অবশ্য হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যা ধ্বংস হয়েছিল তা এমন নয় যাতে জাপানের সমগ্র যুদ্ধ-ক্ষমতা অন্তর্হিত হতে পারে, কিন্তু এই ধ্বংসলীলার দ্বারা তাদের কাছে অবিসংবাদিতভাবে প্রকট হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র নূতন রকমের ভয়ঙ্কর এক অস্ত্রলাভ করেছে এবং তা ব্যবহার করবার ক্ষমতাও তাদের আছে।

জাপানীরা তখন দেখেছে যে, তাদের শহরগুলির উপর দিয়ে সহস্র সহস্র বিমান উড়েছে, সেগুলি থেকে বোমা বর্ষণ হলে কি দশা হয়, তাও তারা জেনেছে। কিন্তু সেই সহস্র সহস্র বিমান থেকে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে বোমা পড়েছে, তাই যদি পড়তে থাকে, তা'হলে কি ফল হবে তা তাদের কল্পনার

তীত। তখনকার দিনের প্রচলিত বোমা দ্বারা বর্দ্ধিতহারে আক্রান্ত হওয়ার কথা তারা জানত, হয়ত পবিত্র মাতৃভূমির প্রত্যেক ইঞ্চি জমির জন্য জীবন পণ করে মরতেও তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু চোখের সামনে সমস্ত জাপান দেশটা টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে তা ভিন্ন কথা।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে আমাদের যতগুলি পারমাণবিক বোমা ছিল, তা যদি জাপান সরকার জানতে পারত (হিরোসিমা ও নাগাসাকির পর আর একটিও তৈরী ছিল না), তা'হলে তারা হয়ত তখন আত্মসমর্পণ করত না। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করেছে। পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা, সাধারণই বা বলি কেন, পৃথিবীর অনেক সামরিক ও কূটনীতিজ্ঞদের ধারণাও (এমন কি আমাদের দেশেরও), এই একটি তথ্য দ্বারা খুব বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছে।

জাপানের আত্মসমর্পণের পর ধারণা হ'ল যে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমন অস্ত্র আছে, যার একটি প্রয়োগ করলে শহর ধ্বংস হয়, আর দু'টি প্রয়োগ করলে একটি যুদ্ধ জয় হয়। একটা মজার কথা, এই ঘটনায় আমেরিকার জনসাধারণ কতকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। বস্তুতঃ মার্কিণ জনগণের মধ্যে এই প্রকার প্রতিক্রিয়া হওয়ায় তা তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষেরই পরিচায়ক হয়ে উঠে। অনেক আমেরিকান বিজ্ঞানী স্পষ্টই বললেন যে, এই দানবীয় শক্তিকে পৃথিবীতে আনার জন্য যে দায়িত্ব তাঁদের আছে, তার জন্য তাঁরা ঘোরতর প্রমাদ গুণছেন। পারমাণবিক বোমাকে কেউ বললেন, 'চরম অস্ত্র', কেউ বললেন, 'কল্কির অগ্রদূত', কেউ বললেন, 'নরকের আভাস'। আমাদের অনেক পুরোহিত ও অসামরিক নেতা এই বোমা ব্যবহারের নৈতিক সমর্থন খুঁজে পেলেন না, এবং যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট এক অভূতপূর্ব প্রস্তাব উত্থাপন করে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করতে এবং কোনও আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের হাতে পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণ করতে রাজী হলেন।

এইসব ব্যবহারে ও উক্তিতে এই ধারণাই ছড়িয়ে পড়ল যে, হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, তা সকল অস্ত্র অপেক্ষা খারাপ, এমন কি যুদ্ধ অপেক্ষাও খারাপ। এইসব যুক্তিকে যদি যৌক্তিকতার চরমে নিয়ে যাওয়া যায় ত মনে হবে যে প্রতিবেশী রাজ্যকে আক্রমণ করা, তার শহরগুলিকে জ্বালিয়ে দেওয়া, সে দেশের স্ত্রী ও শিশুদিগকে হত্যা করা বরং চলবে, কিন্তু নিজ দেশ রক্ষার জন্য পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা চলবে না। সে যাই হোক, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যখন হ'লই না এবং যখন বোঝা গেল যে সোভিয়েট কমিউনিজমের আক্রমণাত্মক মতলবগুলিকে ঠেকাবার জন্য একমাত্র প্রাচীর এই বিভীষণকর পারমাণবিক বোমাদ্বারাই গাঁথা হতে পারে, তখন আমরা আরো বড় ও আরো উন্নততর বোমা তৈরী করে জমাতে লাগলাম, যাতে প্রয়োজন হলে আমাদের বিমানপোতগুলি তাদের যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারে। আমাদের সামরিক বাহিনী কি দেশে, কি ইউরোপে, কি দূরপ্রাচ্যে যেমন সঙ্কুচিত হয়ে আসতে লাগল, তেমনি পারমাণবিক বোমাই আমাদের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়াতে লাগল।

এই অবস্থার ভালোমন্দ দু'দিকই আছে। খারাপ এই যে, আমরা এমন অবস্থায় গিয়ে পড়লাম যাতে আমাদের অস্ত্রাগারের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্রটিকে সযত্নে ঢেকে রাখা হ'ল। অত্যন্ত চরম অবস্থা না হলে, ঘরে বিবেকের যন্ত্রণা সহ্য করে এবং বাইরে দুর্নীতির কলঙ্ক বহন করে তাকে বার করা চলে না। এ কথাটা রাশিয়ানদের মত কেউই ভালো জানে না। এর জন্যই তারা যুদ্ধোত্তর জগতে অনেকখানি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পেরেছে। পারমাণবিক বোমাগুলিকে সযত্নে ঢেকে রাখা হয়েছে জেনে ও আমাদের অন্যক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা আছে জেনে তারা ক্রমান্বয়ে এমন সকল অবস্থার সৃষ্টি করে চলল, যা আমাদের খুব গুরুতর মনে হলেও ততখানি নয় যাতে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা চলে। এইসব অবস্থায় পারমাণবিক ধ্বংসলীলায় পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে

বিলুপ্তির ভয়ও রাশিয়ানদের রইল না, অথচ তাদের নিজ মতলব অনুযায়ী চলবার কোন বাধা হ'ল না।

ভালোর দিক এই যে, আমাদের পারমাণবিক একচেটিয়া অধিকারের জন্য এবং আমাদের বোমার ভাণ্ডারটির জন্যই রাশিয়ানদের পক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া-রূপ নির্বুদ্ধিতা সম্ভব হয়নি। তারা প্রকাশ্য যুদ্ধ বাদে বাকী সব কিছুই করেছে। এজন্যই মনে হয়, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমাদের অন্যান্য অস্ত্রসম্ভার যখন বেশ ক্ষীণ ছিল, তখন একমাত্র পারমাণবিক বোমার ভাণ্ডারই মুক্ত জগৎকে নিরাপদে রক্ষা করেছে।

এখন তথাকথিত হাইড্রোজেন বোমার কথা আলোচনা করা যাক্। পারমাণবিক শক্তিক্ষেত্রে এর প্রভাব অনেকখানি। স্বয়ম্ভু অভিজ্ঞেরা এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেন। কিন্তু সরকার সাধারণ পারমাণবিক বোমার সম্বন্ধেই বিশেষ কিছু বলতে চান না, আর হাইড্রোজেন বোমা সম্বন্ধে ত একেবারে নীরব।

সরকারীভাবে যা জানানো হয়েছে উহা মাত্র এই :—

(১) ১৯৫০ সালের ৩১শে জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, তিনি পারমাণবিক শক্তি কমিশনকে সকলপ্রকার অস্ত্র, মায় তথাকথিত হাইড্রোজেন বোমা সম্বন্ধে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন।

(২) ১৯৫১ সালের ২৫শে মে কমিশন ঘোষণা করেন যে, এনিওয়েটকে কতকগুলি অস্ত্রের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা গিয়েছে। তার মধ্যে প্রেসি-ডেন্টের ৩১শে জানুয়ারীর নির্দ্দেশমত থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্রের গবেষণামূলক পরীক্ষাও হয়েছে।

(৩) ১৯৫২ সালের ১৬ই নভেম্বর কমিশন ঘোষণা করেন যে, প্রেসিডেন্টের ৩১শে জানুয়ারীর (১৯৪৬) ঘোষণা অনুযায়ী এনিওয়েটকে আর এক দফা অস্ত্র-পরীক্ষা হয়েছে। এবারও পারমাণবিক গবেষণা সহায়ক পরীক্ষাদি চালানো হয়েছে।

(৪) ১৯৫৩ সালের ৭ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট টু্ম্যান 'রাষ্ট্রের অবস্থা' সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষ ভাষণে বলেন, 'সম্প্রতি এনিওয়েটকে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্ববিপ্লবী পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে আর এক ধাপ অতিক্রম করেছি। এখন থেকে মানুষ ধ্বংসের এক নূতন যুগে পৌছাল, যেখানে এমন পরিমাণ বিস্ফোরক শক্তির উদ্ভব সম্ভব, যার কাছে হিরোসিমা ও নাগাসাকির বিধ্বংসী মেঘচ্ছত্র নিতান্তই নগণ্য।'

এখন পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে অবিসংবাদী সত্য ও তথ্যগুলি সংক্ষেপে ক্রমিকভাবে বর্ণনা করব।

(১) যুদ্ধে দু'টি পারমাণবিক বোমা প্রয়োগ করা হয়েছে। সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, তাদের ধ্বংসকারী শক্তি বিশ হাজার টন টি এন টির সমান।

(২) এই বোমাগুলি লক্ষ্যস্থলের উপর শূন্যে ফাটানো হয়েছিল। উহার ফলাফল সুবিদিত। বেশীর ভাগ হতাহতই বিস্ফোরণের পরোক্ষ ফলে অর্থাৎ বিচ্ছুরিত ভগ্ন টুকরা ও উত্তাপজনিত অগ্নিলীলায় হয়েছে। সকলপ্রকার উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বিস্ফোরণেই এরূপ ঘটে। এ সকলের বিরুদ্ধে অসামরিক আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। বোমার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে উত্তাপের দ্বারা, তারপর বিস্ফোরণ-জনিত ঝটিকা, শেষে তেজ নির্বাপণ দ্বারা। এ সবগুলিরই বিপজ্জনক প্রভাব হ্রাস করা যায় উপযুক্ত অসামরিক আত্মরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা, বিশেষ করে লক্ষ্যস্থল থেকে লোকজন সরিয়ে নিয়ে। এখন জানা গিয়েছে যে, পারমাণবিক বোমা থেকে যে তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা ছড়িয়ে যায়, তা খুব গুরুতর নয়, কেননা হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলার অল্পদিনের মধ্যেই বাসিন্দারা ঐখানে ফিরে যায়, তাতে তাদের ক্ষতি হয়নি।

(৩) যুদ্ধোত্তর পরীক্ষা ও গণনায় জানা গিয়েছে যে, পরমাণু বোমায় যে পরিমাণ ক্ষেত্র ধ্বংস হয়, তা বেশ হ্রাস করা যায়, যদি বিস্ফোরণটি মাটির নীচে বা জলের নীচে হয়। কিন্তু তা বেশী মারাত্মক হয় এবং বিস্ফোরণোত্তর

তেজস্ক্রিয়তা বাড়ে। মোট হতাহতের সংখ্যা অনেকগুলি ব্যাপারের উপর নির্ভর করে, যেমন, লোক-বিস্তৃতি, বিস্ফোরণের বিশেষ স্থানটি, বায়ু যেদিক থেকে বইছে, বোমার আয়তন ইত্যাদি। অবশ্য বিস্ফোরণোদ্ভব তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে বাঁচবার নানা উপায় আছে, যেমন: স্নান, দূষিত কাপড়-চোপড় সরিয়ে ফেলা, বিশেষ নিরাপদ আধারে রক্ষিত খাদ্য খাওয়া, আর তেজস্ক্রিয়তাদুষ্ট স্থানগুলিকে সাবান, জল ইত্যাদি দ্বারা ধোওয়া।

(৪) অসামরিক লোক ও সাংবাদিকগণ যুদ্ধের পরে যে চারটি বিস্ফোরণ দেখার সুযোগ পেয়েছেন, তাদের শক্তি হিরোসিমার বোমার শক্তির তিন-চতুর্থাংশ থেকে দু'গুণ পর্যন্ত। কাজেই এই প্রকার বিস্ফোরণের সঙ্গেই মাত্র জগৎ পরিচিত। সরকারীভাবে অবশ্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, হিরোসিমার অপেক্ষা অনেকগুণ শক্তিশালী বোমা আমাদের ভাণ্ডারে আছে। অথচ এ কথাও বলা হয়েছে যে, উহা অপেক্ষা কম শক্তিশালী বোমাও তৈরী করা হয়েছে। আর একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ যতই কম শক্তিশালী হোক, সাধারণ বিস্ফোরক বোমার অপেক্ষা তা অনেক বেশী।

(৫) ইহা সুবিদিত যে, যুক্তরাষ্ট্র বোমা ছাড়া অন্যান্য প্রকারের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করছে। সাধারণ অস্ত্র যতরকমের আছে, পারমাণবিক অস্ত্রও তত-রকমের করার চেষ্টা হচ্ছে. ইহা সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে, যেমন, কামানের গোলা, নিয়ন্ত্রিত দূরপাল্লায় ক্ষেপণাস্ত্র, নৌ-বহরের অস্ত্র, বড় লক্ষ্যবস্তুর জন্য বড় বোমা, ছোট লক্ষ্যবস্তুর জন্য ছোট বোমা ইত্যাদি। আমাদের লক্ষ্য হ'ল, বিপক্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, অথচ এমন অস্ত্র হাতের গোড়ায় রাখা, যাতে যুদ্ধক্ষেত্রেও বিপক্ষ. সৈন্য অগ্রসর না হতে পারে।

(৬) ১৯৫১ সাল থেকে আমাদের নেভাডায় ৩১ রকমের ও এনিওয়েটকে অন্ততঃ ৬ রকমের অস্ত্রের পরীক্ষা হয়েছে। এখন জানা গিয়েছে যে, নেভাডায় কামানের জন্য পারমাণবিক গোলা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।

(৭) আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার এত পূর্ণ যে, এই সংক্রান্ত মালগুলিকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদক পারমাণবিক চুল্লী নির্ম্মাণরূপ শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করার কথা বলতে পারেন। তবে আমরা দেখছি যে পারমাণবিক শক্তি কমিশন তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করছেন। তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার যতখানি পূর্ণ হওয়া দরকার, ততখানি হয়নি। সরকার মনে করেন যে, এই বিস্তৃত প্রস্তুতি দ্বারা আমাদের সামরিক বাহিনীর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মিটানো যাবে পূর্বেকার কার্য্যসূচীর অপেক্ষা চার বছর আগে।

(৮) হাইড্রোজেন বোমার দু'টি পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং যথেষ্ট প্রগতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

(৯) আমাদের প্রতি বৈরি মনোভাবাপন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েট রাশিয়াও ১৯৪৯ সাল থেকে পারমাণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করছে—এ এক ভয়ের কথা। অবশ্য আমাদের ভাণ্ডার সোভিয়েট রাশিয়ার অপেক্ষা অনেক বড়, তবু তার জন্য তারা যে আমাদের একেবারে ধ্বংস করার মত যথেষ্ট সংখ্যক অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারবে না এমন কথা বলা যায় না। এটা সত্য যে, লেখার সময় পর্য্যন্ত তারা মাত্র তিনটি পরীক্ষা করেছে। তাতে শুধু এই বোঝায় যে তাদের অস্ত্রের বৈচিত্র্যের অভাব। কিন্তু তাই বলে একথা ভাবা ঠিক হবে না যে, পরীক্ষার অল্পতা অস্ত্রের সংখ্যার অল্পতাই প্রদর্শন করে।

(১০) লৌহ যবনিকার উভয় দিকের পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার যতই বাড়ছে, ততই ঐ অস্ত্র ব্যবহার ও তা থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে প্রগতির উপর ভবিষ্যৎ জগতের পারমাণবিক শক্তির ভারসাম্য নির্ভর করছে।

(১১) এখন একথা আর ভাবা চলবে না যে, পারমাণবিক অস্ত্রগুলি এত বিরল ও ব্যয়সাপেক্ষ যে এক সময়ে একটির বেশী প্রয়োগ করা যাবে না বা তাদের বিস্ফোরক শক্তি বর্ত্তমান বিস্ফোরক বোমাগুলির সঙ্গে বিশেষ অনুপাতে

জড়িত। পারমাণবিক অস্ত্রগুলি একেবারে নির্বিশেষ চরম অস্ত্র—তার লক্ষ্য কোনও সরবরাহ ভাণ্ডার, সৈন্যদল অথবা একটা সমগ্র জাতি, যাই হোক না কেন। কাজেই আমাদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা করার সময় ধরতে হবে যে আমাদের বিরুদ্ধে এত সংখ্যক এবং এমন বিচিত্র পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, যাতে লক্ষ্যবস্তুটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ধ্বংসলীলার প্রকৃতি হয়ত হিরোসিমা ও নাগাসাকির মতই হবে, কিন্তু তার তীব্রতা হয়ত হবে বহু প মাণে পৃথক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শক্তি : শান্তিপূর্ণ লক্ষ্য—প্রথম পর্য্যায়

পারমাণবিক শক্তি নিয়ে যেসব আলোচনা হয়, তার মধ্যে বোমার পরেই সর্ব্বাপেক্ষা মুখরোচক বিষয় হ'ল পারমাণবিক 'শক্তি'। কেননা আমরা পারমাণবিক শক্তির বিকাশ থেকে ভবিষ্যতে যে সকল সমাজ-কল্যাণকর বিবর্ত্তনের আশা করছি, তার মধ্যে ব্যবহারোপযোগী বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। সুতরাং পারমাণবিক শক্তি কথাটি বলবার সময় উহা দ্বারা সঠিক কি বুঝায় আমাদের সেই ধারণা থাকা একান্ত দরকার।

পারমাণবিক শক্তি ঘটিত নূতন বিজ্ঞানের পরিভাষা এখনও সঠিক মানানুযায়ী হয়নি। একই কথার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবে

পারমাণবিক শক্তি বলতে বর্ত্তমানে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে 'তাপ'। নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক আবৃত্ত প্রতিক্রিয়া থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তা তাপের রূপেই দেখা যায়, যেমন কয়লা পোড়ালে তার শক্তিও উত্তাপরূপে দেখা দেয়। তা'হলেই পারমাণবিক 'শক্তি' আমরা সেই অর্থেই ব্যবহার করি যে অর্থে 'কয়লা-শক্তি' বা 'তৈল-শক্তি' প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার করি; অর্থাৎ পরমাণুকে এখানে দাহ্য পদার্থরূপে কল্পনা করি, তার যোগে বৈদ্যুতিক শক্তিকে যেমন দূরে পাঠানো যায়, সেরকম শক্তি হিসাবে মনে করি না। অবশ্য পরমাণু-জাত তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার করা যায়, যেমন কয়লাজাত তাপকে বিদ্যুতে পরিণত করা যায়।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক আবৃত্ত প্রতিক্রিয়াকে নিউক্লিয়ার 'অগ্নি' বললে আদৌ ভুল বলা হবে না। এক্ষেত্রে স্বয়ং-বিভাজনশীল পারমাণবিক পদার্থসমূহকে পারমাণবিক 'ইন্ধন'রূপে ব্যবহার করা হয়—অর্থাৎ ঐগুলিকে 'দগ্ধ' করে (বা বিভাজন-ক্রিয়া চালিয়ে) শান্তিপূর্ণ লক্ষ্য সাধনের উপযোগী তাপ সৃষ্টি করা হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দহনকালে যেমন হয় এক্ষেত্রেও তেমনি 'ভস্ম' অর্থাৎ বিভাজন-জাত দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে। নিউ-ক্লিয়ার 'অগ্নি' নির্ব্বাপিত হবার পর 'ভস্ম'রূপ এই দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়।

অবশ্য পারমাণবিক দহন ও রাসায়নিক দহনের সাদৃশ্য ঐ তাপ ও ভস্মেই শেষ। বৈসাদৃশ্যগুলি বিবেচনা করা যাক :—

(১) রাসায়নিক দহনে সম ওজনের দাহ্য পদার্থে যতখানি উত্তাপ উৎপন্ন হয়, পারমাণবিক দহনে তার অপেক্ষা বহু লক্ষ গুণ বেশী উত্তাপ পাওয়া যায়, যথা, এক পাউণ্ড ওজনের কয়লা পোড়ালে যে পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়, এক পাউণ্ড 'ইউরেনিয়াম-২৩৫' কে পারমাণবিক দহন করলে তার ছাব্বিশ লক্ষ গুণ বেশী উত্তাপ পাওয়া যাবে। পারমাণবিক 'শক্তি'র এটাই হ'ল বড় আকর্ষণ, আর এই জন্যই এই 'শক্তি' লাভের জন্য যে দুরূহ সাধনা তা সম্পূর্ণ সার্থক।

(২) রাসায়নিক দহনের জন্য যেমন অক্সিজেনের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, তেমনি পারমাণবিক দহনের জন্য কোটি কোটি অদৃশ্য পরমাণুর কণা নিউট্রনের প্রয়োজন। নিউক্লিয়ার 'অগ্নি' নিউট্রনের উপর নির্ভর করেই জ্বলে, আবার এই জ্বলনের ফলে যে পারমাণবিক বিভাজন-প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তা থেকে নিউট্রনই জন্মায়। কাজেই নিউক্লিয়ার 'অগ্নি' নিজের ব্যাপ্তির উপায় নিজেই করে। কয়লার তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে যেমন বায়ুর পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তেমনি পারমাণবিক দহনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে নিউট্রনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিউট্রন এত গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেকে সমগ্র কর্মসূচীটিকে 'নিউট্রনের ব্যাপার' বলেই বর্ণনা করেন।

(৩) পৃথিবীতে অনেক বস্তু আছে (কয়লা, কাঠ, পেট্রোল), যাদের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দহন করা যায়, কিন্তু একটি মাত্র প্রাকৃতিক বস্তু আছে, যাকে ঐ প্রক্রিয়ায় দহন করা যায় না, একমাত্র পারমাণবিক নিউক্লিয়ার বিভাজন পদ্ধতিতেই দহন করা চলে। এই বস্তুটি হ'ল, অতি বিরল ইউরেনিয়াম-২৩৫, যা প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ধাতুর এক হাজার ভাগের মধ্যে সাত ভাগ মাত্র পাওয়া যায়। তবে সুখের বিষয় এই যে, ইউরেনিয়াম-২৩৮ ও থোরিয়াম নামক অপর দু'টি প্রাকৃতিক পদার্থকেও পারমাণবিক ইন্ধনে পরিণত করা যায়। প্রথমটি থেকে 'দাহ্য' প্লুটোনিয়াম ও দ্বিতীয়টি থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৩ প্রস্তুত করা যায়। মজার কথা এই যে, এই বস্তু দু'টি তৈরী করতে হলে প্রাকৃতিক বস্তু দু'টিকে নিউট্রন ধারার মধ্যে রক্ষা করলেই হয়। এইরূপ নিউট্রন ধারা ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর আবৃত্ত প্রতিক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায়। কাজেই দেখা গেল যে, নিউক্লিয়ার অগ্নি যে নিজেকে জ্বালাবার উপায় নিজেই করে তা নয়, নিজের ইন্ধন নিজেই তৈরী করে নিতে পারে। ইউরেনিয়াম-২৩৮

এবং থোরিয়াম ইউরেনিয়াম-২৩৫ অপেক্ষা শতগুণে বেশী লভ্য আর ঐগুলিই ভবিষ্যতের পারমাণবিক ইন্ধন।

(৪) রাসায়নিক অগ্নি দেখা যায়, কিন্তু নিউক্লিয়ার 'অগ্নি' দেখা যায় না। জলবার সময় এই অগ্নি থেকে 'এক্স রে'র মত অনেক অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয় যা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক ও কোনও কোনও বস্তুর পক্ষে ক্ষতিকর। এই-জন্যই নিউক্লিয়ার অগ্নির চারিদিকে মোটা সীসা, কংক্রীট বা জলের আবরণের সাহায্যে চারিদিক আবৃত রাখা দরকার, যাতে ক্ষতিকর রশ্মিগুলি ঢাকা পড়ে। তাছাড়া ভস্মাবশেষ যা থাকে তাও অনেকদিন পর্য্যন্ত 'উত্তপ্ত' অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় থাকে এবং সেগুলিকে সাবধানে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়।

(৫) রাসায়নিক অগ্নি খুব সামান্য দাহ্য পদার্থ নিয়ে জ্বালানো যায়, কিন্তু নিউক্লিয়ার অগ্নি জলে না, যতক্ষণ না একটা বিশেষ পরিমাণ দাহ্য পদার্থ একত্র হয়। পদার্থের এই বিশেষ পরিমাণকে বলা হয় 'নির্দ্দিষ্ট ভর-পরিমাণ'। এই পরিমাণের নীচে দহনক্রিয়া চলবার মত যথেষ্ট সংখ্যক নিউট্রন উপন্ন হয় না। কিন্তু 'ভর পরিমাণ' ইহার উর্ধ্বে থাকলে পারমাণবিক ইন্ধনে আপনা-আপনিই প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে।

যে সকল যন্ত্রের মধ্যে পারমাণবিক দহন চলে তাকে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লী বলে। কখনও কখনও তাদের পারমাণবিক 'স্তূপ বা পুঁজিও' বলা হয়, কেননা প্রথম রি-অ্যাক্টরগুলি ইউরেনিয়াম ও গ্রাফাইটের স্তরে স্তরে সাজানো স্তূপরূপে নির্ম্মিত হয়েছিল। কয়লা, গ্যাস বা তেলের চুল্লী যত রকমের হয়, পারমাণবিক চুল্লীও তত প্রকারের হয়। কোনটি আকারে একটি ফুটবলের মত ছোট্ট, আবার কোনটি একটা বাড়ীর মত বড়। কোনটির জন্য খুব বেশী 'শক্তি' প্রয়োগ করতে হয়, কোনটিতে কম। কোনটিতে খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইন্ধন ব্যবহার করতে হয়, কোনটিতে বা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ইন্ধন থাকে। কোনটিতে দাহ্য পদার্থ বাট বা শিকের আকারে, আবার কোনটিতে দাহ্য

পদার্থ তরল দ্রব্যের আকারে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগের আকারভেদে রি-অ্যাক্টর ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয়। ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে প্লুটোনিয়াম তৈরী করার জন্য যে রি-অ্যাক্টর যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তা' থেকে সাবমেরিন চালাবার উপযোগী উচ্চ গতি সম্পন্ন ইঞ্জিন নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত 'রি-অ্যাক্টর' স্বভাবতই ভিন্ন প্রকারের। সে যাই হোক, সকল রকমের 'রি-অ্যাক্টর' যন্ত্রেই নিম্নলিখিত উপাদান থাকে :—

(১) স্বয়ং-বিভাজনশীল ইন্ধন। উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট ; তরল বা কঠিন।

(২) মারাত্মক রশ্মি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আবরক বর্ম। ইহা সাধারণতঃ সীসা বা কংক্রীটের হয়।

(৩) আবৃত্ত প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করবার যন্ত্র, অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা যাতে ইচ্ছামত যন্ত্রটিকে চালানো বা বন্ধ করা যায় এবং যখন ঐ প্রতিক্রিয়া চলে তখন তা বিস্ফোরণে পরিণত না হয় তার ব্যবস্থা করা যায়। এই ব্যবস্থাগুলি সাধারণতঃ নিউট্রন হজম করতে পারে এইরূপ এক ধাতুনির্ম্মিত দণ্ড দ্বারা করা হয়। ক্যাডমিয়াম এইরূপ একটি ধাতু। চুল্লীর মধ্যে এরূপ কতকগুলি দণ্ড থাকে। আঁচ বাড়াবার প্রয়োজন হলে দণ্ডগুলি টেনে নিলেই হয় ; আর যদি সবগুলি একেবারেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তা'হলে চুল্লীতে দহন বন্ধ হয়ে যায়।

(৪) 'রি-অ্যাক্টর' যন্ত্রে যে প্রচুর উত্তাপ উৎপন্ন হয় তা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা। নইলে রি-অ্যাক্টর যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশ গলে যেতে পারে বা অন্যরূপে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। ঠাণ্ডা করার জন্য বায়ু, জল, গলিত ধাতু বা অন্য গ্যাস ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক শক্তি কারখানায় এই উত্তাপই রি-অ্যাক্টর যন্ত্রের বাইরে এনে কাজে লাগানো হয়। ইহার একটি সুস্পষ্ট ও সহজ পন্থা হচ্ছে, ঐ উত্তাপের সাহায্যে জলীয় বাষ্প উৎপাদন করা এবং তারপর সেই বাষ্পের সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা অথবা কোনও জাহাজের স্ক্রু ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করা।

(৫) নিউট্রনগুলির গতিবেগ প্রশমিত করার ব্যবস্থা। পরমাণুর বিভাজন-ক্রিয়া চলবার সময় প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইল বেগে নিউট্রন ছুটতে থাকে। সেগুলি যেখানে ধাক্কা খায় সেখানেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাতেই বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা। এইজন্যই সব রি-অ্যাক্টর যন্ত্রেই 'প্রশমক' বস্তুর ব্যবহার করতে হয়। 'প্রশমক' বস্তুটি চুল্লীর দাহ্য পদার্থের সঙ্গেই মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরণের সবচেয়ে ভালো প্রশমক হচ্ছে গ্রাফাইট, ভারী জল ও বেরিলিয়াম। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ জলেও কাজ হয়। তবে কি প্রকার ও কতখানি 'প্রশমক' প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করে ইন্ধনের বিশুদ্ধির উপর। সাধারণ ইউরেনিয়াম যাতে মাত্র শতকরা এক ভাগেরও কম স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ আছে তাতে সর্ব্বদাই 'প্রশমক' দরকার হয়। যে সকল ইউরেনিয়ামে শোধনের সাহায্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫এর অনুপাত বাড়ানো হয়েছে তাতে 'প্রশমক' কম দরকার হয়। আর যদি বিশুদ্ধ স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ ব্যবহার করা হয় ত প্রশমকের প্রয়োজনই হয় না। তার কারণ দ্রুতগতি-নিউট্রনগুলি বিভাজনশীল নয় এমন পদার্থ দ্বারা বেশী শোধিত হয়, কিন্তু মন্থর নিউট্রনগুলি স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ দ্বারা বেশী শোধিত হয়। যেখানে বিভাজনশীল বা বিভাজনশীল নয় এমন দু'প্রকার পদার্থই একসঙ্গে আছে, সেখানে দ্রুত-নিউট্রনগুলি দ্বারা কোন কাজ হয় না, কেননা সেগুলিকে যে বস্তুটি বিভাজনশীল নয় তা হজম করে নেয়। কাজেই 'প্রশমক' দ্বারা কতকগুলি নিউট্রনের গতি মন্থর না করে নিলে দহন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

'রি-অ্যাক্টর' যন্ত্রের এরূপ বর্ণনা শুনবার পর কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে, 'এই যখন রি-অ্যাক্টর যন্ত্র এবং পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারটাও যখন এই সবই মাত্র, তখন আমরা নিজেরাই কেন রি-অ্যাক্টর তৈরী করে তার মধ্যে কিছু ভারী জল প্রবেশ করিয়ে দিই না এবং কেনই বা এভাবে রি-অ্যাক্টর দিয়ে

আমাদের কাজ করিয়ে নিই না ?' আসলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এত সহজ নয়। কেননা, ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদন করা আর আণ্বিক সঙ্গতিতে কুলায় এমন শক্তি উৎপাদন করার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এই পার্থক্যের বিষয়টা ঐ চিন্তায় স্থান পায়নি ।

আজ পর্যন্ত যত রি-অ্যাক্টর নির্মিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়েছে তাপের আকারে। পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর ১৯৪২ সালে ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি কর্তৃক শিকাগো শহরে নির্মিত হয়। উহাতে যে উত্তাপ হয় তা প্রায় ২০০ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির সমান। এই শক্তি বাড়াবার কোন উপায় ছিল না, কেননা যন্ত্রটিতে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা না থাকাতে যন্ত্রটি গলে যাওয়ার ভয় ছিল। এটি আসলে একটি পরীক্ষামূলক যন্ত্র, উদ্দেশ্য ছিল পারমাণবিক আরও প্রতিক্রিয়া যে চালু রাখা যায় তা দেখানো।

১৯৪২ সালে শিকাগোতে এই প্রথম পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণের পর ম্যানহাট্টান ইঞ্জিনীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট (সামরিক বাহিনীর একটি বিশেষ শাখা) ও পারমাণবিক শক্তি কমিশন এক কুড়িরও বেশী রি-অ্যাক্টর তৈরী করেছেন অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। কেবল প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের জন্যও তাঁরা : তিপয় রি-অ্যাক্টর তৈরী করেন। গত দশ বছরে রি-অ্যাক্টর যন্ত্রের এই বিকাশের ধারা অনুধাবন করার পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের রি-অ্যাক্টর সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ খুবই উপযোগী হবে।

১। সি পি-২

ফের্মির পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হবার পর, তাঁর রি-অ্যাক্টর যন্ত্রটি খুলে ফেলে ১৯৪৩ সালে যে অনুরূপ যন্ত্র তৈরী করা হ'ল তার নাম হ'ল শিকাগো পাইল নং ২, সংক্ষেপে সিপি-২। ফের্মির যন্ত্রের মতই উহাতে সাধারণ

ইউরেনিয়ামকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা হয়, আর প্রশমক হিসেবে গ্রাফাইটকে ব্যবহার করা হয়। উহাতে প্রায় ২০০০ ওয়াট পরিমিত শক্তির উপযোগী তাপ উৎপন্ন হ'ত, আর কংক্রীট ও সীসার বর্ম ছিল। কিন্তু ঐ তাপের পরিমাণ সামান্য হওয়ায় উহাকেও ঠাণ্ডা করার কোন ব্যবস্থা নেই। উহা এখনও শিকাগোর আর্গন জাতীয় বীক্ষনাগারে গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। ওকরিজ গ্রাফাইট রি-অ্যাক্টর

পৃথিবীর তৃতীয় রি-অ্যাক্টরটি ১৯৪৩ সালে ওকরিজে নির্মিত হয়। উহারও ইন্ধন ও প্রশমক আগের দুটির মত। এটিকে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরী করা হয় হ্যানফোর্ডে প্লুটোনিয়াম তৈরীর রি-অ্যাক্টর যন্ত্রের অগ্রদূত হিসেবে। এটি এখনও গবেষণা ও শিক্ষাদান কাজে ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক যে সকল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়, তাদের এই যন্ত্রটিই মূল উৎস। এটি থেকে প্রায় বিশলক্ষ ওয়াট শক্তির উপযুক্ত উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এইজন্য ইহাকে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বায়ু সঞ্চালনের সাহায্যে। কিন্তু এই বায়ু এত উত্তপ্ত হয় না, যা দিয়ে অন্য যন্ত্র চালানো যায়।

৩। হ্যানফোর্ড গবেষণা সহায়ক রি-অ্যাক্টর

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হ্যানফোর্ডের প্লুটোনিয়াম প্রস্তুতকারী বস্তুগুলিকে পরীক্ষা করবার জন্য এই যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়। ইহা একেবারে সিপি-২এর সমতুল্য, কিন্তু উত্তাপ নেই বললেই চলে—মাত্র ১০ ওয়াট।

৪। হ্যানফোর্ডের উৎপাদন রি-অ্যাক্টরসমূহ

এইগুলির মধ্যে প্রথম যন্ত্রটি ১৯৪৪ সালে স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য বোমা তৈরীর জন্য যে প্লুটোনিয়াম দরকার, তার জন্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ থেকে নিউট্রন বার করে তা ইউরেনিয়াম-২৩৮এ প্রয়োগ করা। এই যন্ত্রগুলির ইন্ধন সাধারণ ইউরেনিয়াম, যাতে ইউরেনিয়াম-২৩৮ ও ইউরেনিয়াম-২৩৫ দুইই আছে এবং

গ্রাফাইট প্রশমকরূপে ব্যবহৃত হয়। এই রি-অ্যাক্টরগুলি অনেকতলা বাড়ীর মত এবং ইহাদের মধ্যে হাজার হাজার গ্রাফাইটের ইট ও ইউরেনিয়ামের সিলিণ্ডার থাকে। কয়েকমাস যন্ত্রটি চলার পর ইউরেনিয়াম সিলিণ্ডারগুলি বার করে তা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্লুটোনিয়াম বার করে নেওয়া হয়। রি-অ্যাক্টরগুলি নিকটবর্ত্তী কলম্বিয়া নদীর জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। যন্ত্রগুলিতে এত উত্তাপ জন্মায় যে, নদীর জলস্রোতের অনেক অংশই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালিত হয় এবং সমগ্র নদীর জলের তাপ কিছু বেড়ে যায়। এতখানি উত্তাপ যে মানুষের কাজে লাগে না তাই নয়, উপরন্তু নদীর জল পাম্প করে যন্ত্রের মধ্যে চালান দিতে গিয়েও শক্তির ব্যবহার করতে হয়। কাজেই দু'দিক দিয়েই শক্তির অপব্যয় হয়।

অথচ কোন উপায় নেই। কেননা উত্তাপের পরিমাণ খুব বেশী হলেও তাপ এত বাড়তে দেওয়া যায় না, যাতে জল ফুটতে পারে। তাপ খুব বাড়তে দিলে প্লুটোনিয়াম তৈরীর কাজ খানিকটা ব্যাহত হয়। তাছাড়া হিসেব করে দেখা গেছে যে, রি-অ্যাক্টরের উত্তাপ ব্যবহার করতে হলে যে সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে, তা করলে শক্তি সরবরাহে যে খরচা পড়বে, তার অপেক্ষা কম খরচেই ব্যবসায়িক প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী শক্তি নিকটবর্ত্তী উৎস হতেই পাওয়া যেতে পারে।

৫। সি পি-৩

শিকাগোর এই তিন নম্বর রি-অ্যাক্টরটি ১৯৪৪ সালের মে মাসে সম্পূর্ণ হয়। এই যন্ত্রটিতেই প্রথম ভারী জলকে নিউট্রনের প্রশমক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইহাকে প্রধানতঃ পরীক্ষার জন্য ও ভারী জলের প্রশমক গুণের পরিমাণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহাতে ইউরেনিয়ামের বারগুলিকে ভারী জলের চৌবাচ্চায় ঝুলিয়ে নেওয়া হয়। সি পি-৩এ প্রথমতঃ প্রাকৃতিক

ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হ'ত, কিন্তু পরে ১৯৫০ সাল থেকে শোধিত ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হতে থাকে। এই শোধিত ইউরেনিয়ামে ইউ-২৩৫এর অনুপাত শতকরা ০.৭ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত করা হয়। সি পি-৩ থেকে প্রায় ৩ শত কিলোওয়াট তাপশক্তি পাওয়া যায় এবং যন্ত্রটিকে ঠাণ্ডা করা হয় প্রশমক ভারী জলকে একটি তাপশোষক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালিত করে।

৬। ওয়াটার বয়লার

লস আলামসে স্থাপিত এই যন্ত্রটি ১৯৪৪ সালে সম্পূর্ণ হয়। এই যন্ত্রটিতে দাহ্য ইন্ধন তরল দ্রব্যের আকারে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতির ইউরেনিয়ামকে শোধিত করে ইউ-২৩৫ এর অনুপাতে বাড়িয়ে প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ করা হয়। এই শোধিত ইউরেনিয়ামের সাহায্যে ইউরেনাইল সালফেট বা ইউরেনাইল নাইট্রেট প্রস্তুত করে তা জলে দ্রব করা হয় এবং ইন্ধনরূপে এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। কিছুক্ষণ দহনকার্য্য চলবার পর যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় তাতে ঐ তরল ইন্ধন ফুটতে থাকে, এইজন্য ইহার নাম 'বয়লার'। দ্রব পদার্থটি মরে পড়ে না এমন ইস্পাতের 'পাত্রে' থাকে আর তার মধ্যে থাকে শীতল জলবাহী নলকুণ্ডলী। এই ওয়াটার বয়লারকেই পরমাণু বোমা নির্ম্মাণের সহায়ক গবেষণা কার্য্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রথমে ইহার শক্তি ছিল মাত্র এক ওয়াটের ১/২০ ভাগ, কিন্তু এখন তা ৪৫ কিলোওয়াটে উঠেছে। এই রি-অ্যাক্টরটি এখনও চালু আছে।

৭। ক্লেমেণ্টাইন

এই রি-অ্যাক্টরটি লস আলামসে ১৯৪৬ সাল হতে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত চালু ছিল। এই যন্ত্রটির তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাতেই প্রথম শুদ্ধ স্বয়ং-বিভাজনশীল

ইন্ধন ব্যবহার করা হয়, কাজেই ইহাতে প্রশমক বস্তু ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এই যন্ত্রটিকেই প্রথম তরল ধাতুদ্বারা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা হয়। বিশুদ্ধ প্লুটোনিয়াম এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়, ইহাতে সম্পূর্ণ দ্রুতগামী নিউট্রন দ্বারা আবৃত্ত প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে বলে ইহার আর এক নাম 'দ্রুত রি-অ্যাক্টর। যন্ত্রটির চতুর্দ্দিকে পাবদ পাম্প করে যন্ত্রটিকে ঠাণ্ডা করা হ'ত। এটিতে মাত্র ২৫ কিলোওয়াট তাপশক্তি তৈরী হ'ত।

৮। ব্রুকহ্যাভেন রি আক্টর

ব্রুকহ্যাভেন জাতীয় বীক্ষণাগারে এই যন্ত্রটি গবেষণার সুবিধার জন্য ১৯৫০ সালে তৈরী করা হয়। এটি মূলতঃ ওকরিজ গ্রাফাইট রি-অ্যাক্টরের অনুরূপ, কেবল আকারে বড় এবং অনেক বেশী শক্তির সমতুল্য উত্তাপ সৃষ্টি করে। ইহাতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে ইন্ধনরূপে আর গ্রাফাইটকে প্রশমকরূপে ব্যবহার করা হয়। উদ্ভূত তাপ ৩০ হাজার কিলোওয়াটের সমতুল্য। যন্ত্রটির চারিধারে লোহা ও কংক্রীটের আবরণ এবং বায়ু দ্বারা উত্তাপ হরণ করা হয়। এই যন্ত্রটিতে বায়ু প্রায় ৩৩০° ফারেনহাইট পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কাজেই ইহাকে কোন বয়লারের নলের মধ্যে দিয়ে চালিত করলে বয়লারের মধ্যস্থ জল সহজেই ফুটে জলীয় বাষ্প উৎপাদন করতে পারে, যদিও খুব ভালোভাবে পারে না। কিন্তু এইভাবে বাষ্প উৎপাদন করতে যে খরচ দরকার তা করার আবশ্যকতা নেই বলে সেভাবে যন্ত্রটিকে কখনও ব্যবহার করা হয়নি।

৯। সন্তরণবাপী

এই যন্ত্রটিকে ওকরিজে ১৯৫১ সালে তৈরী করা হয়। ইহার এই প্রকার নামের কারণ এই যে যন্ত্রটি বিশ ফিট গভীর জলের মধ্যে ঝোলানো আছে। জল ঠাণ্ডা করার কাজেও যেমন লাগে, তেমন আবার বিপজ্জনক রশ্মির বিরুদ্ধে আবরণের কাজও করে। ইহাতে ১০ কিলোওয়াট উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

১০। পরীক্ষামূলক প্রজনন রি-অ্যাক্টর

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের আইডাহোস্থিত কারখানায় এটি ১৯৫১ সালে সম্পূর্ণ হয়। এই রি-অ্যাক্টর যন্ত্রের সাহায্যেই পৃথিবীতে প্রথম পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। উৎপন্ন বিদ্যুৎ বীক্ষণাগার আলোকিত করা এবং যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম পরিচালনা করা, যায় ঠাণ্ডা করার পাম্পিং যন্ত্র পর্য্যন্ত প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হলেও এই যন্ত্রটির মূল উদ্দেশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা নয়। ইহাব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পারমাণবিক স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থগুলির 'প্রজনন'। আগেই বলা হয়েছে যে, পারমাণবিক চুল্লীতে যে নিউট্রন উৎপন্ন হয় তা দিয়েই ইউ-২৩৮কে প্লুটোনিয়ামে ও থোরিয়ামকে ইউ-২৩৩'তে পরিণত করা যায়, আর উৎপন্ন বস্তু দুটিকে ঐ চুল্লীসমূহে ইন্ধনরূপেও ব্যবহার করা যায়। প্রজননের কথা এইজন্য উঠে যে, দহন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ইন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে ক্রমাগতভাবে নতুন ইন্ধনের জন্ম হয়, অর্থাৎ বেড়ে যেতে থাকে। এরকম প্রজনন সম্ভব করে তুলতে পারলে পৃথিবীতে যত ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম পাওয়া যায়, তার সবটুকুকেই স্বয়ং-বিভাজনশীল পারমাণবিক ইন্ধনে পরিণত করা যায়। এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য ঐ যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করা হয়, এর ইংরাজী নাম দেওয়া হয়েছে, Experimental Breader Reacher, সংক্ষেপে ই বি আর। বাংলায় বলা চলে পরীক্ষামূলক প্রজনন রি-অ্যাক্টর। ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন ঘোষণা করেন যে, তাঁরা পারমাণবিক ইন্ধন প্রজননের কার্য্যে সফল হয়েছেন।

যন্ত্রটি মূলতঃ উপরে বর্ণিত ক্লেমেণ্টাইন রি-অ্যাক্টরের অনুরূপ অর্থাৎ এর ইন্ধন বিশুদ্ধ, কোনও প্রশমকের দরকার হয় না এবং তরল ধাতু দ্বারা শীতল করা যায়। তফাৎ এই যে, এ যন্ত্রটি অনেক বেশী ক্ষমতাশালী, ইন্ধন হিসেবে প্লুটোনিয়ামের বদলে ইউরেনিয়াম-২৩৫ আর ঠাণ্ডা করার জন্য পারদের বদলে গলিত সোডিয়াম বা পটাশিয়াম ব্যবহার করা হয়। এই ধাতুগুলি যখন শীতলী-

করণের পর যন্ত্রটি থেকে নির্গত হয়, তখন তার তাপ থাকে ৬৬২° ফারেনহাইট অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে বাষ্পোৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। এই বাষ্প একটি টারবাইন যন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে প্রায় আড়াই শত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু যন্ত্রটির খরচা পড়েছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ ডলার বা দেড় কোটি টাকা। কাজেই উৎপন্ন বিদ্যুৎ বড়ই মহার্ঘ্য। ব্যবহারোপযোগী শক্তির এটি একটি নিদর্শন, কিন্তু এটি আর্থিক সঙ্গতির বাইরে।

১১। উপাদান পরীক্ষণ রি-অ্যাক্টর

এই রি-অ্যাক্টরটিও আইডাহোতে ১৯৫২ সালে সম্পূর্ণ হয়। উদ্দেশ্য, যে সকল বস্তু দ্বারা রি-অ্যাক্টর যন্ত্রের বহিরঙ্গ নির্মিত হয়, তার উপর নিউক্লিয়ার রশ্মির প্রভাব পরীক্ষা করা। এজন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে উপাদান পরীক্ষণ রি-অ্যাক্টর। এর ইন্ধন হিসেবে বেশ উন্নত ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। আর বিশুদ্ধ জল যেমন প্রশমনের কাজ করে, তেমন রি-অ্যাক্টরটিকে ঠাণ্ডা করার কাজও করে। যন্ত্রটির কাজ মন্থর নিউট্রন দ্বারাই চলে। ইহার একটি ছোট মডেল ওকরিজে ১৯৫০ সালে নির্মিত হয় এবং এখনও সেটি চালু আছে।

১২। সমজাতীয়তা পরীক্ষণ রি-অ্যাক্টর

এই যন্ত্রটি ওকরিজে ১৯৫২ সালে নির্মিত হয়, আর এটিই দ্বিতীয় যন্ত্র যা থেকে ব্যবহারোপযোগী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। পরীক্ষামূলক প্রজনন রি-অ্যাক্টরের মতই কিন্তু এই যন্ত্রটিরও মুখ্য উদ্দেশ্য শক্তি উৎপাদন নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য, ইন্ধন, প্রশমক ও শীতলীকরণের উপকরণরূপে পদার্থগুলি সমজাতীয় তরল মিশ্রনের মধ্যে রাখা চলে কিনা তা পরীক্ষা করা। এজন্য এর ইংরাজী নাম দেওয়া হয়েছে Homogeneous Reactor Experiment—সংক্ষেপে H. R. E. অর্থাৎ সমজাতীয়তা পরীক্ষণ রি-অ্যাক্টর। যেমন পরীক্ষামূলক প্রজনন রি-অ্যাক্টর বা ই বি আর কতকটা ক্লেমেন্টিনের অধিকতর শক্তিশালী সংস্করণ,

তেমনি এই যন্ত্রটিও লস আলামসের 'ওয়াটার বয়লার' যন্ত্রটির অধিক শক্তিশালী সংস্করণ। এটি থেকে যে ক্ষমতা উৎপন্ন হয় তার দ্বারা প্রায় পঞ্চাশটি গৃহে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ এত বেশী যে তা ব্যবহার করা সাধ্যাতীত। এই রি-অ্যাক্টরটি নির্মাণের খরচ পড়েছে ১০ লক্ষ ডলার এবং তার বিকাশ সাধনের খরচ পড়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ ডলার।

১৩। সি পি-৫

এই রি-অ্যাক্টরটি আর্গন জাতীয় বীক্ষণাগারে সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। সি পি-৩ যন্ত্রটি যেখানে গড়া হয়েছিল, সে জায়গাটা সরকার আইনতঃ ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকায়, ঐ যন্ত্রটি ভেঙে ফেলতে হবে। সি পি-৩ রি-অ্যাক্টরের পরিবর্তেই উক্ত সি পি-৫ নির্মিত হয়েছে। এই যন্ত্রটিকে মূলতঃ গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হবে। এখানে ইন্ধন হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিশোধিত ইউ-রেনিয়াম এবং প্রশমক ও শীতলকারী উভয় হিসেবেই ভারী জল ব্যবহার করা হয়। এটি থেকে ব্যবহারোপযোগী উত্তাপ না পাওয়া গেলেও ভারী জলের গুণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাবে বলে আশা করা যায়।

১৪। সাবমেরিন থার্মাল রি-অ্যাক্টর (এস টি আর)

পারমাণবিক শক্তিদ্বারা চালিত পৃথিবীর প্রথম সাবমেরিন 'নটিলাসে' যে যন্ত্র ব্যবহার করা হবে, এটি তারই অগ্রদূত। এটি পারমাণবিক শক্তি কমিশনের আইডাহোস্থিত পরীক্ষাগারে স্থাপিত। আসল যে যন্ত্রটি সাবমেরিনে লাগানো হবে, সেটি ওয়েষ্টিং হাউস কর্পোরেশন দ্বারা কমিশনের পিট্সবার্গ বীক্ষণাগারে নির্মিত হচ্ছে। ইন্ধন হিসেবে ইউ-২৩৫ দ্বারা পুষ্ট প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। ইউরেনিয়াম ধাতুর ইটগুলি খুব বিশুদ্ধ জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। জল প্রশমকের কাজ তো বটেই, আবার ঠাণ্ডা করার কাজেও লাগে। রি-অ্যাক্টরে উৎপন্ন উত্তাপ জলের দ্বারা বাহিত হয়ে একটি বয়লারে পৌছায়।

বয়লারের উৎপন্ন বাষ্প একটি টারবাইনের মধ্য দিয়ে গিয়ে সাবমেরিনের যন্ত্রকে চালায়, এবং তারপর একটি টারবো-জেনারেটরে পৌঁছুবার পর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই রি-অ্যাক্টরে নিউট্রনগুলিকে মন্থর করে নেওয়া হয়, যাতে উত্তাপ সৃষ্টির কাজ ভালোভাবে চলতে পারে। এটিকে সেজন্য সাবমেরিন থার্মাল রি-অ্যাক্টর নাম দেওয়া হয়েছে, সংক্ষেপে এস টি আর।

এই যন্ত্রটি ঐতিহাসিক দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য, কেননা এখানেই প্রথম পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানো হচ্ছে। অর্থনীতির দিক থেকে বিচার করলে এই শক্তি অত্যন্ত দুর্মূল্য। কিন্তু দেশরক্ষার প্রশ্ন জড়িত থাকলে খরচার দিকে দেখা চলে না। সামরিক দিক থেকে পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিনের সুবিধা এই যে, এ রকম সাবমেরিন জলের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত থেকে সহস্র সহস্র মাইল যেতে পারে। সাধারণ সাবমেরিনের শক্তির উৎস হচ্ছে বৈদ্যুতিক ব্যাটারী। ব্যাটারীর চার্জ ফুরিয়ে গেলেই ডিজেল ইঞ্জিন চালিয়ে সেগুলিকে চার্জ করতে হয়। ডিজেল ইঞ্জিন চালাবার জন্য হাওয়ার দরকার, কাজেই তাকে জলের উপর ভেসে উঠতে হয়। তখন আর উহা সাবমেরিন থাকে না! পারমাণবিক যন্ত্রের জন্য হাওয়ার দরকার হয় না, কাজেই ইহার দ্বারা চালিত সাবমেরিন যতক্ষণ ইচ্ছা জলের নীচে থাকতে পারে, যতক্ষণ না নাবিকদের খাদ্যভাণ্ডার ফুরায়।

১৫। সাভানা নদীর উৎপাদন রি-অ্যাক্টর

হ্যানফোর্ডের উৎপাদন রি-অ্যাক্টরের মত সাভানার রি-অ্যাক্টরগুলি পারমাণবিক বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার মালমশলা তৈরীর জন্য স্থাপিত। যে জন্যই স্থাপিত হোক, এগুলি থেকে প্রচুর উত্তাপ উৎপন্ন হবে এবং ফলে পরমাণু বিজ্ঞানীরা ব্যবহারোপযোগী শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে আরও বেশী জানবার সুযোগ পাবেন। হ্যানফোর্ডের রি-অ্যাক্টরগুলিতে প্রশমক হিসেবে ব্যবহার করা হয়

গ্রাফাইট, কিন্তু সাভানাতে ভারী জল ব্যবহৃত হবে। সাভানার যন্ত্রগুলি শিকাগোর সি পি-৩ এবং সি পি-৫ এর কাছে অনেকখানি ঋণী।

১৬। সাবমেরিন ইণ্টারমিডিয়েট রি-অ্যাক্টর (এস আই আর)

এই রি অ্যাক্টরের একটি অনুকৃতি তৈরী করা হচ্ছে নিউইয়র্কে স্কেনেক-টাডিতে 'নলস্ পারমাণবিক শক্তি বীক্ষণাগারে'। যে উদ্দেশ্যে এস টি আর তৈরী হয়েছিল, এটিও সেই উদ্দেশ্যে তৈরী, তফাৎ এই যে এতে খুব মন্থর নিউট্রনের পরিবর্তে মাঝারি বেগের নিউট্রন ব্যবহৃত হয়। নিউট্রনের বেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বেরিলিয়ম ধাতু ব্যবহৃত হয়। আশা যে মাঝারি বেগের নিউট্রন ব্যবহার করা হলে দহনকার্য্য বেশী সময় স্থায়ী হবে। এই যন্ত্রে পুষ্ট ইউরেনিয়ামকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা হয়, আর যন্ত্রটিকে গলিত সোডিয়াম ধাতু দ্বারা ঠাণ্ডা করা হয়। এই রি-অ্যাক্টরটি খুবই উন্নত প্রণালীর, তবে এতে যা খরচা পড়ে তাতে শুধু সামরিক বিভাগেই এর ব্যবহার চলতে পারে।

১৭। বিমান রি-অ্যাক্টর

পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে যে সকল দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ চলছে তার মধ্যে পারমাণবিক শক্তি চালিত বিমানপোত অন্যতম। এ কাজ যেমন খুব কঠিন, তেমন খরচ সাপেক্ষ। যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর জন্য বিমান-ইঞ্জিন তৈরী করার কাজ শুরু হয়েছে এবং কমিশনের আইডাহো-স্থিত রি-অ্যাক্টর পরীক্ষাগারে ইহার পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও হয়েছে। কল্পনা যদি সফল হয়, তা'হলে আমাদের বিমানবাহিনীর বিমানগুলি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নূতন ইন্ধন ব্যতিরেকেই আকাশে উড়তে পারবে। একবার আকাশে উঠলে কয়েকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে। জটিলতা এই যে, বিমান-চালকদের তেজস্ক্রিয় রশ্মি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখতে পারে, এমন

আবরণ হাল্কা বস্তুর দ্বারা তৈরী হওয়া চাই। সীসা বা কংক্রীটের আবরণে যে চলবে না একথা বলাই বাহুল্য। অবশ্য এ সমস্যার সমাধান হবে, তবে সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ।

১৮। জাহাজী রি-অ্যাক্টর

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রগুলি আকারে ছোট এবং দহনকার্য্য খুব পরিচ্ছন্নভাবে হয়। এইজন্য সামরিক দিক থেকে ইহা এত কাম্য। বড় বড় জাহাজও যদি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা চালানো যায়, তা'হলে প্রথমতঃ গতি-বিধির পরিধি অত্যন্ত বেড়ে যাবে, তার উপর হাওয়া যাওয়ার ব্যবস্থা, কয়লা রাখার ব্যবস্থা, সহজদাহ্য তৈল রাশি রাশি সাবধানে লওয়ার সমস্যা থাকে না। কাজেই কমিশন বিমানবাহক জাহাজের মত বড় জাহাজের জন্য পারমাণবিক যন্ত্র নির্ম্মাণের কাজেও সম্প্রতি হাত দিয়েছেন। তবে কৃতকার্য্যতা যথেষ্ট অর্থব্যয় সাপেক্ষ। আশা করা যায় যে এই যন্ত্র নির্ম্মাণের কাজ সফল হলে সেইপ্রকার যন্ত্রদ্বারা শুধু যে জাহাজই চালানো যাবে তা নয়, স্থলে বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা যাবে।

উপরি লিখিত বর্ণনা থেকে গত দশ বছরে যত রকমের রি-অ্যাক্টর তৈরী করার চেষ্টা হয়েছে তার ধারণা পাওয়া যাবে। প্রথম রি-অ্যাক্টরগুলি নির্ম্মিত হয়েছিল শুধু দেখার জন্য যে পারমাণবিক আবৃত্ত প্রতিক্রিয়া চালু রাখা যায় কিনা। পরে ঐ রি-অ্যাক্টরগুলিরই অধিকতর শক্তিশালী সংস্করণ করা হ'ল, তাড়াতাড়ি প্লুটোনিয়ামের ভাণ্ডার ভর্ত্তি করার জন্য। পরে নানাপ্রকার পরীক্ষা-মূলক যন্ত্র তৈরী হতে লাগল। এই যন্ত্রগুলির প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ক্ষমতার সৃষ্টি করে, হয়ত মাত্র এক ওয়াটের এক দশমাংশ, কিন্তু উৎপন্ন ক্ষমতাকে সহজে ব্যবহার করা খুব কঠিন ছিল।

তারপর ১৯৫১ ও ১৯৫৩ সালে আইডাহো এবং ওকরিজে যথাক্রমে ই বি

আর ও এইচ আর ই রি-অ্যাক্টর স্থাপিত হ'ল। এই রি অ্যাক্টরগুলি থেকেই পরীক্ষার সহায়ক ব্যবহার্য্য শক্তি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা হ'ল। বর্ত্তমানে সাভানা নদীর কারখানা ছাড়া কমিশনের অন্যান্য কর্ম্মসূচীর বড় অংশ হ'ল সামরিক উদ্দেশ্যে পারমাণবিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করার চেষ্টা—সাবমেরিনে, বিমানপোতে, জাহাজে। কিন্তু কয়লা, তৈল বা গ্যাসের পরিবর্ত্তে পারমাণবিক ইন্ধন ব্যবহার করার মত অবস্থা আসতে এখনও অনেক দেরী আছে।

এখানে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, মানুষে সাধারণতঃ যেভাবে ব্যবহার্য্য শক্তি উৎপাদন করে তার মূল্য সর্ব্বত্র সমান নয়। কোন কোন জায়গায়, যেমন আফ্রিকার ভেতর দিকে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে বা সুমেরু অঞ্চলে এক কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করতে প্রায় ৩ সেণ্ট খরচা পড়ে। এমন কি আমাদের পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রেও ঐ পরিমাণ শক্তির দাম ১ সেণ্ট থেকে ২ সেণ্ট পর্য্যন্ত হতে পারে। এমন কি শিকাগো শহরে পর্য্যন্ত এক কিলোওয়াট ঘণ্টার জন্য ·৬ থেকে ·৭ সেণ্ট খরচ পড়ে। আবার উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী যে অঞ্চলসমূহে জলপ্রপাতের ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়, সেখানে হয়ত ·২৫ সেণ্ট মাত্র খরচা পড়ে।

কাজেই পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন আর্থনীতিক দিক থেকে সার্থক কিনা তা বিচার করতে হবে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে। যেমন, সুমেরু প্রদেশে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার যোগ্য করতে যে খরচা পড়বে, তা হয়ত নিউইয়র্ক বা পিটসবার্গের শিল্পপতিদের কাছে অত্যন্ত মহার্ঘ্য বলে মনে হবে। কিন্তু সুমেরুতে কয়লা বা তৈল বহন করে নিয়ে সাধারণ উপায়ে ক্ষমতা উৎপাদন করার যা খরচা তার তুলনায় হয়ত উহা কমই। কাজেই মনে হয় যে পৃথিবীর প্রথম ব্যবহারিক পারমাণবিক রি অ্যাক্টর যা অসামরিক জনসাধারণের কাজে আসবে তা স্থাপন করতে হবে এমন স্থানে, যেখানে সাধারণ ইন্ধনের দাম বেশী। অনেকে বলেন, পৃথিবীতে ত এমন স্থান আছেই, এমন কি আমাদের

দেশেও এমন স্থান আছে, যেখানে পারমাণবিক ক্ষমতা উৎপাদন এখনই অর্থ-নীতির দিক থেকে সার্থক।

কথাটা হয়ত সত্য। কিন্তু বর্তমানে এরূপ আলোচনা নিরর্থক, কেননা এখনও শুধু শক্তি উৎপাদনের জন্য কোন পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর নির্মিত হয়নি এবং বিজ্ঞানীরা এখনও এই উদ্দেশ্যে কোন্ ডিজাইনটি সবচেয়ে ভালো, যা সবচেয়ে কম খরচায় বেশী শক্তি উৎপাদন করবে, কোন মীমাংসায় পৌঁছুতে পারেন নি। ১০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-ক্ষমতা উৎপাদন করতে পারে এমন রি-অ্যাক্টর নির্মাণ করতে হলে এখন প্রায় এক কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ পড়বে, আর উৎপন্ন শক্তির খরচ পড়বে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় পাঁচ সেণ্ট। কিন্তু উহার অপেক্ষা ছ'গুণ বেশী খরচে এমন রি-অ্যাক্টর তৈরী করা যায়, যাতে পূর্ব্বাপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী ক্ষমতা পাওয়া যায়, অথচ খরচ পড়ে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা ৮ সেণ্ট।

অবশ্য এ বিষয়ে কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না, কেননা এই প্রকার আসল রি-অ্যাক্টর এখনও তৈরী হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও আমরা অনেক কথা জানতে পারব। তবে মোটামুটি যে হিসেব দেওয়া হ'ল, তা বর্ত্তমানে সঠিক বলে মনে করা যেতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্ষমতা : শান্তিপূর্ণ লক্ষ্য—দ্বিতীয় পর্য্যায়

বর্ত্তমানে আমরা শক্তি উৎপাদনকারী পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর যন্ত্রের সুদূর-প্রসারী ও চাঞ্চল্যকর উন্নয়নের আভাস পাচ্ছি। তবে এই বিষয়ের গবেষণা-মূলক প্রাথমিক যন্ত্রগুলি যদি বিজ্ঞানের কেন্দ্র শহরগুলি থেকে খুব দূরে নির্জ্জন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে খুব ভাল ফল হবে কিনা সন্দেহ। প্রথম যে রি-অ্যাক্টর মাত্র অসামরিক জনসাধারণের সুবিধার জন্যই নির্ম্মিত হবে তা পুরাপুরি চালু যন্ত্র হিসেবে তৈরী না হয়ে পথ-প্রদর্শক অগ্রদূত হিসেবেই নির্ম্মিত হবে। এরূপ যন্ত্রকে যদি সত্যসত্যই বাস্তব রূপ দিতে হয়, তাহলে এমন জায়গায় সে যন্ত্রটি স্থাপন করা দরকার যেখানে এরকম যন্ত্রের ডিজাইন করা, নির্ম্মাণ করা, চালনা করা এবং পরিশেষে, এসব কাজ থেকে যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করার সামর্থ্য আছে এমন সব বিজ্ঞানীরা বাস করেন। কাজেই এরকম রি-অ্যাক্টর নির্ম্মাণ করার উদ্দেশ্য হবে কিভাবে একে আরও উন্নত করা যায়, ব্যবসায়ের দিক থেকে এটা করা হবে না। বর্ত্তমানে যে সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হবে তারা যে অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হবে শুধু তাই নয়, তারা ভবিষ্যতের উন্নত ধরণের যন্ত্রের অপেক্ষা কম নির্ভরশীল ও কম নিপুণ হবে। সাবমেরিনে কম নিপুণ বা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, কেননা সেখানে সামরিক সুবিধাই মূল লক্ষ্য (আইডাহোর এস টি আর নামক অনুরূপ যন্ত্রটি নির্ম্মাণের খরচ পড়ে ২ কোটি ডলার, সাবমেরিনের ইঞ্জিন নির্ম্মাণের পক্ষে যা খুবই ব্যয়সাধ্য), কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে চাইলে, যত কম খরচে শক্তির

যতখানি নির্ভরযোগ্য উৎস পাওয়া যায় ততখানি উৎসের জন্যই ব্যবসায়ী চেষ্টা করবেন।

ব্যবসায়ে ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্র যে শুধু অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়েই নির্ম্মাণ করতে হবে তাই নয়, ইহা এমন হওয়া চাই যে খুব উচ্চ তাপে অনেকদিন পর্য্যন্ত চলতে থাকলেও বিকল হবে না বা অধিক ব্যয়ে মেরামতের দরকার হবে না। অথচ অনেকখানি উত্তাপকে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে পরিণত করতে পারবে।

খুব উচ্চ তাপে পৌছান ও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই তাপ রক্ষা করা বড়ই জটিল সমস্যা। যন্ত্রের অঙ্গগুলি এমন বস্তুতে গড়া চাই, যা উচ্চ তাপ এবং তীব্র তেজস্ক্রিয় রশ্মি সহ্য করতে পারে এবং কোনও মতেই ভেঙে বা ফেটে যায় না। শুধু তাই নয়, যন্ত্রটি যে বস্তুতে গঠিত হবে তা এমন হওয়া চাই যে আবৃত্ত প্রতিক্রিয়ার চালক নিউট্রনগুলিকে শোষণ করবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ সর্ব্বগুণনিধি বস্তু পৃথিবীতে দুর্লভ, কাজেই সেই সব বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করতে অর্থ ও সময় দুইই লাগে। রি-অ্যাক্টর যন্ত্রে ব্যবহার করার যোগ্য বস্তুর খোঁজ করবার জন্যই আইডাহোতে বস্তু পরীক্ষাকারী রি-অ্যাক্টর ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। ফলে বহুমূল্য ধাতু জার্কনিয়াম সকল দিক দিয়েই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। এই ধাতুটি প্রকৃতিতে হীরকাকৃতি জার্কন পাথর থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম যখন জার্কনিয়াম জার্কন থেকে নিষ্কাশিত হয়, তখন তার খরচা পড়ে প্রতি পাউণ্ড তিনশত ডলার, এখন কিন্তু এর প্রতি পাউণ্ডের দাম মাত্র ১৫ ডলার এবং ইহার দাম আরও কমছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর তৈরীর খরচ পারমাণবিক যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাবে।

পারমাণবিক আবৃত্ত প্রতিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলার আধার যদি বা নির্ম্মিত হ'ল তাতে উৎপন্ন তাপ যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে ব্যবহার্য্য শক্তিতে পরি-

বর্জিত করা, সেও কম কঠিন ও জটিল নয়। গলিত সোডিয়ামের মত তাপ সঞ্চালনকারী বস্তু যন্ত্ররাজ্যে একেবারেই অভিনব। এর জন্য চাই এমন যন্ত্রাঙ্গ যার মধ্যে বিন্দুমাত্র বায়ু প্রবেশ করবে না, যা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না এবং যা থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বাইরে আসতে পারবে না। এরূপ যন্ত্র যদি নির্মাণ করা যায়, তা'হলে তা ব্যবহারের জন্যই নির্মাণ করতে হবে। সুবিধামত এখানে খানিকটা পাইপ বদলানো, ওখানে খানিকটা তাপ্পি দিয়ে মেরামত করা, এসব চলবে না, কেননা এরূপ করতে গেলে তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে মিস্ত্রীর মৃত্যু অনিবার্য্য। এই তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এখন কি অবস্থা আছে, তা এই থেকেই বোঝা যাবে যে ওকরিজে যে সমজাতীয় পরীক্ষণ রি-অ্যাক্টর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাতে ১ হাজার কিলোওয়াট উত্তাপ থেকে মাত্র ১৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, অথচ কয়লাদ্বারা চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রে অন্ততঃ ওর দ্বিগুণ পাওয়া যেত।

অবশ্য এ সকল সমস্যার নিশ্চয়ই সমাধান হবে এবং বাস্তবিকপক্ষে সামরিক বাহিনীর বাহনদের পারমাণবিক ক্ষমতা দ্বারা চালিত করার উদ্যোগে হচ্ছে সাবমেরিন, বিমানপোত ও বড় বড় জলপোতের জন্য যে সকল রি-অ্যাক্টর তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে তাতে কত অভিনব ধাতু, নূতন নূতন পরিকল্পনা ও কৌশলের আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলি এতদিন হয়ত সাধারণ্যে প্রকাশ পেত না, যদি না দেখা যেত যে, কোন অসামরিক প্রতিষ্ঠান, খরচার দিকে লক্ষ্য না করে রি-অ্যাক্টর নির্মাণ করতে প্রস্তুত আছে।

পারমাণবিক শক্তি শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে তৈল-শিল্পের সেই যুগ যখন প্রথম সাবমেরিনে ডিজেল ইঞ্জিন লাগানো হয়। পারমাণবিক রি-অ্যাক্টরের মত ডিজেল ইঞ্জিনও প্রথম কার্য্যকরীভাবে সাবমেরিনে প্রয়োগ করা হয়। বাস্তবিক ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কার না হলে সাবমেরিন চলতই না, কেননা জলের নীচে বাষ্পীয় যন্ত্র চলে না। কিন্তু সাবমেরিনে যে

প্রথম ডিজেল যন্ত্র ব্যবহার হয়, তা খরচার দিক দিয়ে দেখলে একেবারেই অচল। কোন রেল বা মোটর কোম্পানী সে সময়ে সেই প্রারম্ভিক ডিজেল ইঞ্জিন নিজেদের ব্যবহারের জন্য কিনত না। ব্যবসায়ীরা তখনই ডিজেল যন্ত্র ব্যবহার করতে লাগল, যখন যন্ত্রগুলি যথেষ্ট উন্নত হ'ল, যখন তাদের দাম বেশ হিসাবের মধ্যে আসল, যখন ডিজেল যন্ত্রে ব্যবহার্য ইন্ধন বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে লাগল এবং তার বিতরণের ব্যবস্থা এমন উন্নত হ'ল যে, সকল স্থানে প্রায় একই খরচায় পাওয়া যায় এবং যখন বোঝা গেল যে ডিজেল ইঞ্জিন টেঁকসই ও নির্ভরযোগ্য। পারমাণবিক রি-অ্যাক্টরও সাধারণের ব্যবহার্য হবে না যতক্ষণ না এইরূপ অবস্থার উন্নতি হয়।

এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে যা'কিছু গবেষণা ও উন্নয়ন হয়েছে তা সরকারী চেষ্টায়। অবশ্য সরকার বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই এসব কাজ চালিয়েছেন, কিন্তু তবু উহা সরকারী প্ররোচনায়, সরকারী খরচায় ও সরকারী সম্পত্তি হতে। ইহাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। প্রথম ১৯৪৬ সালের পারমাণবিক শক্তি আইন অনুযায়ী সমস্ত স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ ও সমস্ত প্রকার গবেষণা সহায়ক যন্ত্রের উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং এতৎ সংক্রান্ত যাবতীয় পেটেন্ট এবং সংবাদ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সরকারের হাতে ছিল।

পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে এই সরকারী আধিপত্যের আর একটা কারণ এই যে, পারমাণবিক শক্তির গ্রাহক এতদিন পর্যন্ত একমাত্র সরকারই ছিল: প্লুটোনিয়াম তৈরী করার জন্যই হোক বা সাবমেরিন চালানোর জন্যই হোক, যাকিছু রি-অ্যাক্টর তৈরী হয়, সকলই সরকারী ব্যবস্থার জন্য। তাছাড়া খরচাও পড়ত অসাধারণ এবং কোনরকম আয়ের আশা ছিল সুদূর পরাহত। কিন্তু এখন এ সবই পরিবর্তিত হচ্ছে। পারমাণবিক ক্ষমতা ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত হয়েছে, এখন শুধু খরচা কমাতে পারলেই ইহা সাধারণের আয়ত্তে আসে। শেষ

লক্ষ্যও প্রায় দৃষ্টিপথে এসে পড়েছে।

সমস্যা উঠেছে যে, এখন কি সরকারের উচিত নয় যে সরকারী একচেটিয়া অধিকার খানিকটা পরিত্যাগ করে বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া? খরচা কমানোই যখন প্রধান উদ্দেশ্য, তখন প্রতিযোগিতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ভিত্তিই হ'ল স্বাধীন প্রতিযোগিতা এবং এরই এতাবৎ ফল আশাতিরিক্ত পাওয়া গিয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধের সময় ও তার পর এক্ষেত্রে সরকারী আধিপত্য এত বেশী ছিল যে, সরকারী কর্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই রি-অ্যাক্টর উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে জেনারেল ইলেকট্রিক, ওয়েষ্টিং হাউস, ইউনিয়ন কার্বাইড, ডুপণ্ট ইত্যাদি কোম্পানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কারণ এঁরাই রি-অ্যাক্টর উন্নয়নে সরকারী ঠিকা নিয়েছিলেন।

কিন্তু ঐ সকল জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা পারমাণবিক কলা কৌশল সম্বন্ধে মূল্যবান জ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও বিশিষ্ট নিপুণতা প্রদান করতে সক্ষম। এই প্রতিষ্ঠানগুলি এর মধ্যেই পার-মাণবিক শক্তি কমিশনের কাছে পারমাণবিক বিদ্যার অংশ চেয়ে আবেদন করেছেন। এঁদের এই প্রার্থনা বা দাবী মেটাবার জন্য ওকরিজে কমিশন কর্তৃক চালিত 'স্কুল অফ রি-অ্যাক্টর টেকনলজি'তে শিক্ষাদান শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত যে ২৬৮ জন বিজ্ঞানী এখানে শিক্ষালাভ করেছেন, তার মধ্যে ৮২ জনই বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ১৯৫১ সালে। ঐ বৎসর মূলতঃ মনসাণ্টো কেমিক্যাল কোম্পানির চার্লস টমাসের প্ররোচনায় কমিশন এমন ব্যবস্থা করেন যাতে যে সকল বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারী এক-চেটিয়া অধিকারের জন্য রি-অ্যাক্টর সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল তারা এ বিষয়ে জ্ঞান-

লাভের সত্যকার সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থায় ৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চারটি ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগের দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সকলপ্রকার গোপন তথ্য জানতে দেওয়া হয় এবং কমিশনের কলকারখানায় ও বীক্ষণাগারে হাতে-কলমে পারমাণবিক পদ্ধতি পর্যাবেক্ষণ করবার সুযোগ দেওয়া হয়। এতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিষয়ে কর্মসূচী প্রস্তুত করবার সুযোগ পায়। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নাম হ'ল, মনসান্টো (রসায়ন) এবং ইউনিয়ন ইলেকট্রিক (উপযোগিতা), ডাও (রসায়ন) এবং ডিট্রয়েট এডিসন (উপযোগিতা), বেক্টেল (রসায়ন) এবং প্যাসিফিক গ্যাস এণ্ড ইলেকট্রিক (উপযোগিতা)। চতুর্থ দলে ছিল কমনওয়েলথ এডিসন এবং নর্দার্ণ ইলিনয়েজ ইলেকট্রিক (উভয়েই উপযোগিতা)। এভাবে রাসায়নিক, ইঞ্জিনীয়ারিং এবং উপযোগিতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেককেই পারমাণবিক তথ্যাদি জানবার সুবিধা দেওয়া হয়। মনে করা হয়েছিল যে, এই ধরণের প্রতিষ্ঠানসমূহই এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত হবেন। ১৯৫১ সালে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান পঞ্চম দলে যোগ দেন, তাদের নাম: ফস্টার হুইলার (নির্মাণ) এবং পাইয়োনিয়ার সারভিস ও ইঞ্জিনীয়ারিং (কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং)।

১৯৫২ সালের গ্রীষ্মকালে প্রথম চারটি দলের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এক বছর পর্যাবেক্ষণের পর কমিশনের কাছে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এ সকল রিপোর্টে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য পাঠসূচী এবং যে সমস্ত রি-অ্যাক্টর নির্মাণকালে লোকায়ত্তভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সম্প্রসারণের সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কে কমিশনের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়। চারটি রিপোর্টের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক তফাৎ ছিল, কিন্তু কোনটিই নৈরাশ্যজনক নয়। সকলেই কিন্তু একমত হলেন যে, বেসরকারী পুঁজি যদি এক্ষেত্রে নিয়োগ করতে হয়, তা'হলে পারমাণবিক জ্ঞান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারী একচেটিয়া অধিকার খানিকটা লাঘব করা দরকার। কাজে কাজেই

পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আইনেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

কংগ্রেস যখন ১৯৪৬ সালের পারমাণবিক শক্তি আইন পাশ করেন, তখনই তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে এ বিষয়ের যথেষ্ট অগ্রগতি হলে আইনের ধারাগুলির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হতে পারে। এর জন্য তাঁরা এই ব্যবস্থা করেন যে, সেরকম কোনও সুদিন এলে কমিশন সেকথা প্রেসিডেণ্টের গোচরে আনবেন এবং প্রেসিডেণ্ট বিবেচনা করলে তা কংগ্রেসের গোচরে আনবেন যাতে তাঁরা যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। এরূপ একটা বিধানের প্রয়োজন হয়েছিল, কারণ বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী পারমাণবিক ক্ষেত্রে যিনি যা আবিষ্কারই করুন না কেন, পারমাণবিক শক্তি কমিশন সেই সংক্রান্ত শিল্প নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার স্বতঃই অর্জ্জন করবেন। বেসরকারী পারমাণবিক শিল্পের অভ্যুত্থান ঘটলে যে এ ব্যবস্থা চলতে পারে না, একথা কংগ্রেস উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

১৯৪৬ সালের পারমাণবিক শক্তি আইনের ৭ (খ) ধারাটি এরূপ: 'যখনই কমিশনের মতে কোন শিল্পে, ব্যবসায়ে অথবা অন্য অসামরিক ব্যাপারে স্বয়ং-বিভাজনশীল বস্তু বা পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার এতাদৃশ উন্নতি লক্ষিত হবে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্য্যকরী বলে মনে হবে, তখনই তাঁরা প্রেসিডেণ্টের কাছে একটি রিপোর্ট দেবেন। রিপোর্টটিতে এই প্রকারের ব্যবহার সংক্রান্ত সকল তথ্য, এইরূপ ব্যবহারের সামরিক, রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থনীতিক ও আন্তর্জাতিক প্রভাব সম্বন্ধে কমিশনের মতামত এবং প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় পরিপূরক আইন সম্বন্ধে তাঁদের প্রস্তাব থাকবে। প্রেসিডেণ্ট এই রিপোর্ট তাঁর সুপারিশসহ কংগ্রেসের নিকট পেশ করবেন। কমিশন এই ধারা অনুযায়ী কোন প্রকার নির্ম্মাণ, উৎপাদন, রপ্তানী বা ব্যবহারের লাইসেন্স দিতে পারবেন না যতক্ষণ না (১) ঐ নির্ম্মাণ, উৎপাদন, রপ্তানী বা ব্যবহার সংক্রান্ত রিপোর্ট কংগ্রেসে দাখিল করা হয় এবং (২) রিপোর্ট দাখিলের পর অন্ততঃ ৯০ দিন (যে সময় কংগ্রেসের অধিবেশন চলতে থাকবে) গত হয়।

ধারাটি পড়লে যেন মনে হয় কংগ্রেস ধারণা করেছিলেন যে, শিল্পক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির নূতন ব্যবহারের কৌশল হঠাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হবে। এখন কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, পারমাণবিক শক্তির আর্থনীতিক ব্যবহার হঠাৎ আবির্ভূত হবার সম্ভাবনা নেই, ইহা কলা কৌশলের ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে ধীরে ধীরেই আসবে।

কংগ্রেসের পরিকল্পিত দিনটিতে যদি এখনও আমরা পৌছে না থাকি এবং এখনও যদি বলতে না পারি যে 'আমরা পারমাণবিক শক্তির বাস্তব ব্যবহার শিখেছি, সুতরাং পারমাণবিক শক্তি আইনটিকে এখন আবার ঢেলে সাজাতে হবে' এবং সম্ভবতঃ অকস্মাৎ আমরা সেই দিনটিতে পৌছুতে পারবও না, তা'হলে ঠিক এখনই পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের কার্য্য-কৌশলে যে যান্ত্রিক উন্নতি ঘটেছে, সেই সম্পর্কে আমাদের নীতি খাপ খাইয়ে নেবার কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমার মতে সমস্ত আইনটি নূতন করে লিখবার সময় এখনও আসেনি। কেননা এখনও আমরা উন্নয়নের গণ্ডি অতিক্রম করিনি। কাজেই ঠিক কি ধরণের আইনের দরকার, তার কোন ধারণা আমাদের নেই। এছাড়া এখনও আইনের বাঁধন হাল্কা করলে আমাদের শস্ত্র-নির্ম্মাণ-সূচীর ক্ষতি হতে পারে। এখনও ঐ কর্ম্মসূচীকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিতে হবে।

এখন আমাদের নীতি হওয়া উচিত যাতে প্রতিযোগিতা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ প্রতিযোগিতার মারফৎ খরচ কমের দিকে যায়। এরজন্য যতটুকু দরকার আইন সংশোধন করতে হবে, তবে এত ব্যাপকভাবে পরিবর্ত্তন করলে চলবে না, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের হাত-পা বাঁধা হয়ে যায়। মোটের উপর, কি আইনের দিক থেকে কি কলা-কৌশলের দিক থেকে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যে পারমাণবিক শক্তি আর্থিক দিক থেকে লোকায়ত্ত হয়।

নানারকম সমস্যার মধ্যে এখনকার সমস্যা এই প্রশ্ন নিয়ে যে, কে কতটুকু করবে। একদিকে এতাবৎকাল সমস্তই করেছেন সরকার, অন্যদিকে বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুই করেন নি, যেটুকু করেছেন তা শুধু সরকারী ঠিকা নিয়ে। আমার মতে এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার, কেননা ভবিষ্যতে আমাদের এমন রি-অ্যাক্টর দরকার যা জাতীয় তথা বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজস্ব স্থান অধিকার করতে পারবে। একমাত্র স্বাধীন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রতিযোগিতার জন্য অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করতে পারে, খরচা কমাতে পারে ও নতুন নূতন ব্যবহারের পদ্ধতি কল্পনা করতে পারে। শুধু তাই নয়, খোলাবাজারে ক্রয়-বিক্রয় না হলে আর্থনীতিক সার্থকতা হ'ল কিনা বোঝা যাবে না।

বেসরকারী উদ্যমের সহযোগিতা না পেলে প্রায়োগিক উন্নতির নিয়ন্ত্রক হবে কংগ্রেস, যাঁরা বায় সঙ্কোচের দিকে যতটা নজর রাখবেন, সত্যকার প্রগতির দিকে ততটা নয়। তাছাড়া যখন পারমাণবিক শিল্প নিজগুণে প্রতিষ্ঠিত হবার মর্য্যাদা লাভ করবে, তখনও তা সরকারের একচেটিয়া সম্পত্তিতেই থেকে যাবে, ফলে সে সংক্রান্ত কলা-কৌশল সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে যাবে এবং পারমাণবিক ইন্ধন সম্বন্ধে সামরিক বিভাগের দাবী অন্যায় হলেও সর্বাগ্রে গ্রাহ্য হবে।

অবশ্য আমি সরকারী-বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যে অনবরতঃ তর্কজালের সৃষ্টি হচ্ছে তাতে যোগ দিতে চাই না। আমার বক্তব্য এই যে, এদেশে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনকারী শিল্পের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তা একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠানের করায়ত্ত থাকা উচিত নয়। কোন মিউনিসিপ্যালিটি বা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান যদি জনসাধারণের কল্যানের জন্য পারমাণবিক রি অ্যাক্টর চালাতে চান, তা'হলে তাদের বঞ্চিত করতে আমি চাই না। আইন সকলের পক্ষে সমান হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা এমন হওয়া চাই যে কেউ যদি এই নবকৌশলে কোন অবদান যোগাতে চায়, তা'হলে সে যেন কোনও বাধা না পায়। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একই নিয়ম দ্বারা চালিত করা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পারমাণবিক ক্ষমতা উৎপাদন শিল্পে আকর্ষণ করার

প্রয়োজনীয়তা যদি স্বীকৃত হয়, তা'হলে আমার মতে নিম্নলিখিত কার্যাক্রম অবলম্বন করতে হবে।

(১) প্রথমতঃ সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে বেসরকারী পুঁজিপতি রি-অ্যাক্টর ও তার দ্বারা উৎপন্ন শক্তি বিক্রয় করতে পারবেন। এর জন্য পারমাণবিক শক্তি আইনের যে ধারায় রি-অ্যাক্টরগুলিকে সরকারের একচেটিয়া সম্পত্তি করা হয়েছে, সেই ধারাটির সংশোধন করা দরকার।

(২) শিল্পপতিদের এই আশ্বাসও দিতে হবে যে রি-অ্যাক্টর তৈরী হলে তাতে ব্যবহার্য্য ইন্ধন তারা স্বাধীনভাবে কিনতে পারবেন ও ক্রীত বস্তু তাদের সম্পত্তি বলে গ্রাহ্য হবে। এই যে শুধু যন্ত্রকে চালু করার জন্য প্রথম দফার ইন্ধন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তা নয়, পরে যন্ত্রটিকে চালু রাখতে হলে যে সকল বস্তু সরবরাহ করা দরকার তাদের সম্বন্ধেও খাটে। কাজেই বর্ত্তমান আইনে স্বয়ং-বিভাজনশীল বস্তুকে সরকারী সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে যে ধারাটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তারও কিছু পরিবর্তন দরকার।

(৩) শিল্পপতিরা এ আশ্বাসও চাইবেন যে বর্ত্তমানে পারমাণবিক শক্তি কমিশন গোপনতা বজায় রাখার জন্য যেসকল কড়া উপবিধি প্রণয়ন করেছেন, তাকে খানিকটা ঢিলা করা হবে। নাহ'লে রি-অ্যাক্টর তৈরী করা ও চালাবার জন্য যে সকল তথ্য জানা দরকার তা তারা জানতে পারবেন না। এজন্য হয় শক্তি উৎপাদনকারী রি-অ্যাক্টর সংক্রান্ত তথ্যগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করতে হবে, না হয় এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এই তথ্যগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ্যে না হলেও আমেরিকান শিল্পকুশলীদের কাছে প্রকাশে কোন বাধা থাকবে না। রাশিয়ায় যখন বোমায় ব্যবহার্য্য প্লুটোনিয়াম তৈরী করার মত রি-অ্যাক্টর চালু হয়ে গিয়েছে এবং যখন মাত্র শিল্পকুশলীদের কাছে প্রকাশ করা তথ্যকে জনসাধারণের কাছে গোপন রাখা কত দুরূহ তা বিবেচনা করা যায়, তখন রি-অ্যাক্টর সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়, নাহ'লে পারমাণবিক

ক্ষমতা উৎপাদন শিল্প কখনই আর্থনীতিক সার্থকতার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না।

(৪) আগামী কয়েক বছর আমরা রি অ্যাক্টর যন্ত্রের বিকাশ সাধনের কাজে লিপ্ত থাকব এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রি-অ্যাক্টর নির্ম্মণের কাজে লিপ্ত থাকবে। তার পরে কমিশনের নীতি ও আইন হয়ত এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নব উদ্ভাবিত কৌশলের পেটেণ্ট পাবার অধিকারী হন।

ইতোমধ্যে দ্রুত প্রগতির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে সরকারকে কমিশন মারফৎ উন্নত প্রণালীর রি-অ্যাক্টর নির্ম্মাণ সংক্রান্ত গবেষণার পুরোভাগে থাকতে হবে ও প্রধান অংশ গ্রহণ করতে হবে। শুধু যে সামরিক ব্যবহারের জন্য তা নয়, বেসরকারী ব্যবহারের জন্যও। যদিও কমিশনের পক্ষে কখনও বড় বড় রি-অ্যাক্টর চালনা করে সাধারণের মধ্যে বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ব্যবসায় শুরু করা উচিত হবে না, তথাপি পরমাণু থেকে ব্যবহার্য্য শক্তি নিষ্কাশণ করার জন্য নিজেদের বীক্ষণাগারে বা শিল্পক্ষেত্রে গবেষণা চালাবার দায়িত্ব কমিশনেরই। কেননা কমিশনেরই আয়ত্তে সাধারণের বহু কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তৈরী বীক্ষণাগারগুলি। এইগুলিতেই অতীতের সমস্ত গবেষণা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের অনেকখানি গবেষণা হবে। যে সকল বেসরকারী শিল্প রি-অ্যাক্টর নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে রত হবে তাদের কাছে ঐ বীক্ষণাগারগুলির দ্বার বন্ধ রাখা বা তাদের দিয়ে ঐ পরীক্ষাগুলির পুনরাবৃত্তি করা দুইই সমান অসঙ্গত।

রি-অ্যাক্টর সংক্রান্ত যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা এবং আরও অগ্রগতিতে উৎসাহিত করার যে দায়িত্ব কমিশনের রয়েছে সে দায়িত্ব পালন করবার জন্য তাঁদের হয়ত বড় রি-অ্যাক্টরের অগ্রদূতস্বরূপ কয়েকটি পরীক্ষামূলক ছোট রি-অ্যাক্টর নিজেদের খরচায় তৈরী করতে হবে। যে সকল লোক নিজ পুঁজির প্রায় ৬ কোটি থেকে ১২ কোটি ডলার খরচ করে বড় আকারের রি-

অ্যাক্টর তৈরী করার ঝুঁকি নেবেন, তারা আবার যে পরীক্ষামূলক যন্ত্রটি নির্মাণ করার জন্য আরও প্রায় ১ কোটি ডলার খরচ করতে রাজী হবেন এরূপ মনে হয় না। কাজেই শিল্পপতিদের সহযোগিতায় একাজের ভার কমিশনকেই গ্রহণ করতে হবে, তবে এগুলি থেকে যদি সাধারণের ব্যবহার্য্য বিদ্যুৎ বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় বা অন্যান্যভাবে সরকারী ব্যবহার্য্য বস্তু তৈরী হয় ত ভালোই।

সরকারী ও বেসরকারী শিল্পের সহযোগিতাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য কমিশন ১৯৫৩ সালে নিম্নলিখিতরূপ নীতি স্থির করেন। আমি এইগুলির সঙ্গে একমত।

(১) আর্থনৈতিকক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া যায় এমন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা সমগ্র জাতির স্বার্থের দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রি-অ্যাক্টর সংক্রান্ত যন্ত্রবিজ্ঞান এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে উপরোক্ত লক্ষ্য দৃশ্য ভবিষ্যতের আওতায় এসেছে, যদি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে জাতীয় প্রচেষ্টা দ্বারা যথেষ্ট পুষ্ট করা হয়। পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করার ক্ষমতা যদি আমাদের হস্তচ্যুত হয়, তাহলে উহা দেশের পক্ষে একটা বড় পরাজয়।

(২) এক্ষেত্রে উন্নয়ন, গবেষণা এবং ব্যবহার্য্য বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হতে পারে এমন পরীক্ষামূলক রি-অ্যাক্টর নির্মাণের কাজ সম্পর্কে উৎসাহিত করা কমিশনের দায়িত্ব।

(৩) অত্যধিক ব্যয়সাধ্য না হয়, এমন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করার জন্য যে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে কমিশনের বাইরের দক্ষ ও উৎসাহী ব্যক্তিবৃন্দের সহযোগিতাতেই দ্রুত সিদ্ধ হবে।

(৪) এইপ্রকার সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার জন্য নিম্নলিখিতরূপ কতকগুলি সুবিধা দেওয়া দরকার :—

(ক) কমিশন ছাড়া অন্য ব্যক্তিবৃন্দের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন

ব্যবস্থার উপর স্বত্ব অর্জ্জন করার অধিকার লাভ করার জন্য অস্থায়ী বিধান।

(খ) স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থসমূহের লীজ বা বিক্রয় করা আইনসিদ্ধ করার জন্য অস্থায়ী বিধান; অবশ্য জাতীয় নিরাপত্তার দাবী সেই অস্থায়ী বিধানে পুরাপুরি বজায় রাখতে হবে।

(গ) রি-অ্যাক্টর থেকে উপজাত বস্তু এবং স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থের মধ্যে যাকিছু কমিশন নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবেন না, অস্থায়ী বিধান দ্বারা তা সমস্তই হস্তান্তর ও বিক্রয় করার অধিকার রি-অ্যাক্টরের মালিকদের দেওয়া। অবশ্য দেশের ও জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য যে সমস্ত নিয়ম করা প্রয়োজন তার অধিকার কমিশনের সব সময়ই থাকবে।

(ঘ) কমিশনের বীক্ষণাগারে ক্ষমতা উৎপাদন সংক্রান্ত এমন সব গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যা জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য অনুকূল বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) কমিশন দ্বারা যাতে যথাযোগ্য বিবেচিত হয় সেভাবে এবং বর্ত্তমান আইনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পারমাণবিক ক্ষেত্রে পেটেন্টের স্বত্বকে কিছু পরিমাণে উদার করা।

(চ) পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর থেকে অবশ্যম্ভাবী কারণে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয়তা অবাঞ্ছনীয় পরিণতি থেকে জনসাধারণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মগুলিকে প্রয়োজনমত ক্রমিকভাবে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য রাজ্য কর্ত্তৃপক্ষকে ক্রমবর্দ্ধমান দায়িত্ব গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। অবশ্য রি-অ্যাক্টর সংক্রান্ত ব্যাপারে আর্থিক দায়িত্ব রি-অ্যাক্টরের স্বত্বাধিকারীদের ষোল আনা থাকবে, যেমন সাধারণ ব্যবসার ক্ষেত্রে থাকে।

(ছ) জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে রি-অ্যাক্টর যন্ত্রবিজ্ঞানের যে বিশেষ স্থান, তা মেনে নিয়েও এই ক্ষেত্রে সংবাদ পরিবেশন সম্বন্ধে উদার নীতি অনুসরণ করা।

(৫) অস্ত্রনির্ম্মাণে ব্যবহার্য্য প্লুটোনিয়াম ক্রয় করার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি না পেলেও যে প্রতিষ্ঠান আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে, সেরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করাই হবে এই নীতির উদ্দেশ্য।

(৬) আগামী কয়েক বছরে উন্নতির লক্ষ্য হবে কার্যাকরী পারমাণবিক শক্তি লাভের চেষ্টা, আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক শক্তি উৎপাদক রি-অ্যাক্টর নির্ম্মাণের কাজে অর্থ-বিনিয়োগ নয়।

পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন সর্ব্বদা শুনতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, 'এত উদ্যম ও অর্থব্যয়ের সার্থকতা আছে কি?' আমি অনেক লোককেই বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করতে শুনেছি, যখন তাঁদের বলা হয়েছে যে বর্ত্তমানে এই উদ্যম থেকে তারা সবচেয়ে বেশী যা আশা করতে পারেন সে শুধু বিদ্যুৎ প্রাপ্তির এক নতুন উৎস যা তাঁদের মাসিক বিদ্যুতের খরচ থেকে মাত্র কয়েক পয়সা বাঁচাতে পারে।

আসলে এটাই কিন্তু সত্য। তার কারণ, কয়লা ব্যবহারকারী বিদ্যুৎ উৎপাদক ও বিতরক কারখানায় যেসব যন্ত্রপাতি আছে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদক কারখানাতেও তার সবগুলিই দরকার, মাত্র কয়লা দেওয়ার কলটি থাকবে না, থাকবে একটি রি-অ্যাক্টর এবং তার কলারটি হবে ভিন্ন প্রকৃতির। ফলে খরচা কমানোর প্রশ্নই ওঠে না এবং পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর নির্ম্মাণ করার খরচা ভবিষ্যতে যতই হ্রাস পাক না কেন, কয়লার চুল্লী নির্ম্মাণের খরচের চেয়ে তা কম খরচে নির্ম্মাণ করা সম্ভব হবে এরূপ কোনও আভাসই পাওয়া এখনো পর্য্যন্ত যাচ্ছে না।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থায় একমাত্র যাতে খরচ কমবে সে হচ্ছে ইন্ধনের মূল্য। পারমাণবিক শক্তি এত অল্প জায়গায় এত বেশী থাকে যে উৎপন্ন উত্তাপের তুলনায় ইহার ক্রয়মূল্যই যে কম তা নয়, এর পরিবহণ,

নিয়োগ ও গুদামজাত রাখার খরচা অত্যন্ত কম। এখানে এত টাকা বাঁচে যে অনেক অর্থনীতিবিদ্ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের খরচ হিসাব করার সময় পারমাণবিক ইন্ধনের খরচাকে শূণ্য ধরে নিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আজ যদি বিদ্যুৎ তৈরীর কারখানাতে কয়লা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যোগানো হয়, তা'হলেও ক্রেতাদের মাসিক বিদ্যুৎ খরচের ফর্দে অর্থের পরিমাণ পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র কমবে, কারণ কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ ও উৎপন্ন শক্তি, বন্টন ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। পারমাণবিক শক্তি উৎপানকারী যন্ত্র তৈরী করতে কয়লা ব্যবহারকারী যন্ত্র তৈরী করতে যে খরচা পড়ে তার এত গুণ বেশী পড়বে যে ইন্ধন যত সস্তাই হোক, মোট লাভ কম। ইন্ধন সংগ্রহের খরচা বরাবরের জন্য যখন কম পড়বে, তখন প্রাথমিক খরচা খানিকটা বেশী করা চলে, তবু তারও একটা বিশেষ সীমা আছে এবং সে সীমা লঙ্ঘন করা যায় না। কমিশনের আর্গন বীক্ষণশালায় ডাঃ ডব্লিউ এইচ জিন রি-অ্যাক্টের যন্ত্র সম্পর্কে দেশের একজন অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী। তিনি হিসেব করে দেখেছেন যে, ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সমর্থ এমন কয়লা ব্যবহারকারী উৎপাদক যন্ত্র যদি ৪ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্ম্মাণ করা যায়, তা'হলে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে সমর্থ পারমাণবিক কারখানা নির্ম্মাণে ৬ কোটি ডলারের বেশী ব্যয় করা চলে না। অর্থাৎ সাধারণ ক্ষমতা উৎপাদনকারী যন্ত্র থেকে অসাধারণ যন্ত্রে মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ বেশী খরচ করা চলতে পারে। আর বাস্তবিক, বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রবিদদের লক্ষ্য রাখতে হবে ঐ খরচের মধ্যেই পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করা। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির দাম যদি বর্ত্তমানে ব্যবহার্য্য সাধারণ উপায়ে জাত ক্ষমতার সমান বা সামান্য মাত্র কম হয়, তা'হলেও এই উদ্যম ও অর্থব্যয় সার্থক। কারণগুলি নীচে বলছি :—

প্রথমতঃ, যে শক্তি এখন পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা আসে কয়লা, তৈল, গ্যাস, কাঠ বা জলপ্রপাত থেকে। এর মধ্যে কাঠ ও জলপ্রপাত ছাড়া আর

সবগুলিই ক্ষয়িষ্ণু ; অর্থাৎ তাদের খরচ হয়, কিন্তু তাদের পূরণের কোন উপায়ই নেই। এক সময়ে না এক সময়ে পৃথিবীর কয়লা, তৈল ও গ্যাসের ভাণ্ডার নিঃশেষ হবে এবং নিঃশেষ হবার কিছুদিন আগে থেকেই যখন অপেক্ষাকৃত নিকটের স্তরগুলি শেষ হবে, তখন এসব ইন্ধন সংগ্রহের খরচ ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকবে। কাজেই পৃথিবীতে শক্তির নূতন উৎসের প্রয়োজন আছে, আর এই প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের অপেক্ষা অন্য কোন কোন দেশে বেশী, যেমন গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইটালী ও সুইডেন। এই সকল দেশের ভাণ্ডার হয় শূন্য, নয় দ্রুত ক্ষয়ের মুখে।

পারমাণবিক কমিশনের পক্ষ থেকে একজন ইঞ্জিনীয়ার পামার সি পুটনাম সম্প্রতি পৃথিবীর শক্তির উৎস জরীপ করেছেন। তাঁর রিপোর্টে তিনি 'কিউ' নামে একটি পরিমাপের একক ব্যবহার করেছেন। এই এককটি হ'ল, ১০এর পরে ১৮ শূন্য দিলে যা হয় তত ব্রিটিশ তাপের এককের সমান। তিনি দেখিয়েছেন যে, পৃথিবী বর্ত্তমানে প্রতি ১০০ বছরে বিশ 'কিউ' একক পরিমিত শক্তি ব্যবহার করছে এবং যে হারে শক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, তাতে মনে হয় যে ২০০০ সালে এই পরিমাণ হবে প্রতি শতাব্দীতে ১০০ কিউ। এই হিসেবের মধ্যে শক্তির সকল প্রকার ব্যবহারই ধরা হয়েছে, কি জাহাজ, মোটর, ট্রেন বা এরোপ্লেন চালাতে, কি বাড়ীঘর, আফিস ও কারখানা উত্তপ্ত করতে, কি শিল্প কারখানার নানা কাজে, কি বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

এখন এই হিসেবের সঙ্গে পৃথিবীর কয়লা, তৈল ও গ্যাসের বর্ত্তমান ভাণ্ডার তুলনা করলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝা যাবে। যে কয়লাখনি থেকে কয়লা তুললে খরচা পোষাবে এরূপ কয়লার ভাণ্ডার হ'ল ৭০ কিউ, আর অনুরূপ তৈল ও গ্যাসের যুক্তভাণ্ডার হ'ল ৮ কিউ। অতএব পৃথিবীর ইন্ধনের ভাণ্ডার বর্ত্তমান খরচার হারে প্রায় ৪০০ বছর চলবে এবং ২০০০ সালে যে হারে

পৌঁছুবার সম্ভাবনা তাতে মাত্র ৮০ বছর চলবে। এই হিসেবের মধ্যে যেটুকু ভুলচুকের সম্ভাবনা আছে, তা ধরে নিয়েও পরিষ্কার বোঝা যায় যে আমাদের ব্যবহৃত শক্তির বর্তমান উৎস সম্পর্কে বেশী দিন ভরসা নেই। কিন্তু পৃথিবীর ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের যে ভাণ্ডার আছে তাকে যদি শক্তিতে পরিণত করা যায়, তা'হলে ১৭০০ কিউ পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে, অর্থাৎ এমনকি ২০০০ সালের হারেও প্রায় ১৭ শতাব্দী চলবে। পৃথিবীর কয়লা ভাণ্ডারের ৭০ কিউয়ের সঙ্গে তুলনা করলে ব্যাপারটা বেশ উৎসাহজনক তাতে সন্দেহ নেই।

পরমাণুকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার জন্য বিপুল চেষ্টা করার পক্ষে উপরি উক্ত তথ্যগুলি যথেষ্ট। আবার পরমাণুকে আশ্রয় করবার আগে বর্তমানে ব্যবহৃত সমস্ত দাহ্য পদার্থকে শেষ করে দেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কেন না পারমাণবিক যুগেও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈল কয়লা ও গ্যাস ব্যবহার করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি আমরা শক্তি উৎপাদনের প্রচলিত উৎসগুলি থেকে ভার অপসারণ করতে পারব ততই ক্ষয়মাণ কয়লা, তৈল ও গ্যাস তাদের বিশেষ ব্যবহারের জন্য বেশী দিন স্থায়ী হবে। সমগ্র বিদ্যুৎ শক্তি যদি খালি পারমাণবিক শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয়, তা'হলে কয়লা, তৈল ও গ্যাসের ব্যবহার প্রায় শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাবে। আমাদের জাহাজ ও যুদ্ধজাহাজগুলি যদি পারমাণবিক ক্ষমতাদ্বারা চালিত হয়, তা'হলে আমাদের তৈল ভাণ্ডারের অনেকখানিই মোটর গাড়ীর জন্য মজুদ থাকবে। এর প্রয়োজন এই যে, পারমাণবিক রি-অ্যাক্টরে যে রকম ভারী ভারী বর্ম দেওয়া দরকার হয়, তাতে মোটর গাড়ী চালানোর উপযুক্ত রি-অ্যাক্টর তৈরী করা যায় না।

উপরে যে সমস্ত হিসাব-নিকাশ দেওয়া হ'ল, তা একটা মস্ত 'যদি'র উপর নির্ভর করে। সে 'যদি' এই যে, আমরা পৃথিবীতে সহজে ফলিত যত ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম আছে তাকে স্বয়ং-বিভাজনশীল বস্তুতে পরিণত করতে পারি। পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আমার মেয়াদ

শেষ হবার কিছু আগে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নিম্নলিখিত ঘোষণা করেছিলাম :—

'আমাদের দেশের পারমাণবিক শক্তি সম্প্রসারণের ইতিহাসের আর একটি স্মরণীয় অধ্যায়ে আমরা সম্প্রতি পৌঁছেছি। এই আবিষ্কারের দ্বারা আমরা অসামরিক পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনাকে অনেকখানি বাস্তবতার গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনতে পেরেছি।

'এই নতুন অধ্যায়ের গুরুত্ব বুঝাবার জন্য একটা উপমার সাহায্য নেব, যদিও উপমাটি অত্যন্ত সরলীকৃত। ধরুন, পৃথিবীতে মাত্র ১০০ গ্যালন পেট্রোল আছে। উহা ফুরালে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পেট্রোল লোপ পাবে। তারপর ধরা যাক, আমরা জল থেকে পেট্রোল তৈরী করতে পারি, যদি পেট্রোল জলের সান্নিধ্যে জ্বালানো যায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক্ যে, ১০০ গ্যালন পেট্রোল দগ্ধ করে আমরা ৯০ গ্যালন জলকে পেট্রোলে পরিণত করতে পারব, কাজেই যখন পেট্রোল জলের সান্নিধ্যে জ্বালানো যাবে, তখনই দগ্ধ পেট্রোলের শতকরা ৯০ ভাগ জল থেকে পুনর্জীবিত হবে। এতে অবশ্য পেট্রোলের মজুদ ভাণ্ডার অনেকদিন পর্যন্ত কাজে আসবে, কিন্তু এক সময় না এক সময় সেই ভাণ্ডারও শূন্য হবে, তখন পৃথিবীর যাবতীয় জলরাশি আর পেট্রোল তৈরীর কাজে আসবে না।

'কিন্তু ধরা যাক্ যে আমরা যতখানি পেট্রোল পোড়ালাম, ততখানি বা তার অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী জলকে পেট্রোলে পরিণত করতে পারি। তা'হলে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশিকে ক্রমে পেট্রোলে পরিণত করতে পারি। অর্থাৎ কৌশলটি আয়ত্ত হলে পৃথিবীতে পেট্রোলের অভাব আর থাকে না।

'বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকে জানেন যে পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত উপমার মত ব্যবস্থা তত্ত্বীয়ভাবে সিদ্ধ করা যায়। এই ক্ষেত্রে একটি মাত্র স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এ পদার্থটি হ'ল

ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং উহা সাধারণ ইউরেনিয়ামে শতকরা মাত্র ১ ভাগ থাকে। কাজেই খনিজ ইউরেনিয়াম-২৩৫এর ভাণ্ডার বড়ই স্বল্প। তবে বিজ্ঞানীরা অনেকদিনই আবিষ্কার করেছেন যে স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামকে ইউরেনিয়াম-২৩৫এর সান্নিধ্যে জ্বালালে স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থের সৃষ্টি হয়। তাঁরা এটাও জানেন যে, অনুরূপ অবস্থায় থোরিয়ামকেও স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থে পরিণত করা যায়। তবে তাঁরা নিশ্চিত জানতেন না যে, ঐ পরিবর্তন কার্য এমনভাবে চালানো যায় যাতে পুরানো ইন্ধনের সমান বা বেশী নূতন ইন্ধনের সৃষ্টি হয়। তাঁরা কল্পনা করেছেন যে এরূপ করা যায়, তাঁরা এর একটা নামও দিয়েছেন। তাঁরা একে বলেন 'প্রজনন'। পারমাণবিক ইন্ধনের প্রজনন সম্ভব কিনা জানবার জন্যই আইডাহোতে আগন জাতীয় বীক্ষণাগার একটি পরীক্ষামূলক বিশেষ ধাঁচের রি-অ্যাক্টর তৈরী করেছেন।

'আপনাদের হয়ত মনে আছে, এই রি-অ্যাক্টরটি ১৯৫৩ সালে প্রথম পারমাণবিক ক্ষমতা উৎপন্ন করে। আমি এখন খবর পেয়েছি যে বীক্ষণাগারের পরিচালক ডাঃ ওয়াল্টার জিন, 'প্রজনন' পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডাঃ হেরল্ড লিক্‌টেনবার্গার এবং তাঁদের আগনের সহকর্মীরা প্রজনন তত্ত্বকে কার্য্যকরীভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। রি অ্যাক্টরটি এমনভাবে চলছে যে, ইউরেনিয়াম-২৩৫কে পুড়িয়ে সাধারণ ইউরেনিয়ামকে স্বয়ং-বিভাজনশীল প্লুটোনিয়ামে পরিণত করছে এবং উৎপন্ন প্লুটোনিয়ামের পরিমাণ অন্ততঃ দগ্ধ ইউরেনিয়াম-২৩৫এর সমান। 'প্রজনন' বাস্তবে পরিণত হয়েছে এবং এর দ্বারা পারমাণবিক শক্তির উন্নয়নের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

'অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে পারমাণবিক ক্ষমতা আর্থিক দিক থেকে সম্ভব হয়ে উঠেছে। আবার এটাও নয় যে রাতারাতি আমাদের যত স্বয়ং-বিভাজনশীল বস্তু প্রয়োজন তা পেয়ে গিয়েছি। ইহাও নয় যে ইউরেনিয়ামকে মূল্যহীন কোন ইন্ধনরূপে মনে করা যাবে। এমনও হতে পারে যে প্রথম পারমাণবিক শক্তি

উৎপাদন যন্ত্রে হয়ত প্রজননতত্ত্বের প্রয়োগই হবে না। একটি বড় আকারের প্রজনন রি-অ্যাক্টরের অনেক খরচ পড়বে। তাছাড়া নবজাত দাহ্য পদার্থকে পৃথক করে কাজে লাগানোর জন্য যে রাসায়নিক পৃথকীকরণ প্রণালী অবলম্বন করতে হবে তা পারমাণবিক শক্তি শিল্পের অত্যন্ত বহুমূল্য অংশ।

'প্রজননকে বাস্তবে পরিণত করতে ইহাও বোঝায় না যে, আমরা হঠাৎ খনিজ ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়েছি। মোটেই তা নয়। পারমাণবিক প্রজনন অত্যন্ত মন্থর ব্যাপার। রি-অ্যাক্টরটি হয়ত পাঁচ বছর কি তদধিক কাল চললে তবেই যতখানি ইন্ধন নিয়ে যন্ত্র চালানো হয়েছিল, তার সমপরিমাণ নূতন ইন্ধনের জন্ম হবে। বর্ত্তমানে অস্ত্র-নির্ম্মাণের কর্ম্মসূচীর জন্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও প্লুটোনিয়ামের যে চাহিদা বা খনিজ কাঁচা ইউরেনিয়ামের যে চাহিদা তার কিছুই কমবে না।

'প্রজননে'র আসল অর্থ হ'ল এই যে, পৃথিবীর খনিতে যতখানি ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামকে প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যাবে, তার সবখানিই পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো যেতে পারে। অবশ্য আইডাহোতে যখন থোরিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করা হয়নি, তখন তা থেকে যে স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থের উদ্ভব করা যাবে, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

'সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইউরেনিয়ামের উপর প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ পারমাণবিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে আপাতত কোন বিপ্লবের সূচনা এর মধ্যে নেই। তবে ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পন্থায় এর যথেষ্ট স্থান আছে।'

কাজেই পরমাণু পৃথিবীর ক্ষীয়মাণ শক্তিপ্রদ বস্তুগুলির ভাণ্ডারকে পূর্ণ করবার মত অফুরন্ত শক্তির উৎস। অবশ্য পরমাণুর প্রয়োজনীয়তার মাত্র একটি দফা। অন্য দফায় ধরতে গেলে, বিবেচনা করুন, এই দাহ্য পদার্থের প্রায় সম্পূর্ণ ভার শূন্যতা। কি মেরুদেশে, কি মরুভূমিতে, কি সুদূর দ্বীপে,

যেখানে কয়লা বা তৈল পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয় অসম্ভব, নয় দুর্মূল্য, সেখানে সহজেই নিয়ে যাওয়া যাবে। মনে করুন, মরুভূমিতে যথেষ্ট ক্ষমতার উৎস থাকলে জল পাম্প করে সরবরাহ করা যায়। মনে করুন যে একটি সমুদ্র উপকূলস্থ অনুর্বর স্থান, যেখানে সমুদ্রজলকে পরিস্রবণ দ্বারা শোধন করে সরবরাহ করতে পারলে স্থানটি শস্যপূর্ণ ও জলপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এখানে মাত্র প্রয়োজন অল্পমূল্যে যথেষ্ট ক্ষমতার। ধারণা করুন যে ভবিষ্যৎ আর্থিক হিসাব থেকে দাহ্য পদার্থের পরিবহণ খরচা একেবারে বাদ গেল। শিল্পক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাঁচা মাল ও ক্ষমতার উৎস এক জায়গায় থাকে না। একটাকে আর একটার জায়গায় নিয়ে যেতে কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ প্রণালী অবলম্বন করতে হয়। পারমাণবিক শক্তি আয়ত্তে থাকলে একে সহজেই কাঁচা মালের উৎসের কাছে বিনা আয়াসে নিয়ে যাওয়া চলবে। কাজেই পৃথিবীর অনেক স্থানে যেখানে কাঁচা মাল আছে, কিন্তু ক্ষমতাপ্রদায়ী দাহ্য পদার্থ নেই, সেখানে নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়ে জগতের ও আর্থনীতিক ভূগোল বদলে যাবে।

পারমাণবিক ইন্ধন ভারশূন্য ও অল্পস্থান অধিকার করে বলে পরিবহণ প্রণালীতে যুগান্তর আনয়ন করতে পারে। মোটরগাড়ী ছাড়া অন্যান্য যানবাহনে এর ব্যবহার অত্যন্ত সুবিধাজনক। বিমানচালনে পারমাণবিক দাহ্য পদার্থের সাধারণ রাসায়নিক দহনশূন্যত্ব ও স্বল্পপরিসর অধিকার করার গুণ অত্যন্ত কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা।

উপরে যা বলা হ'ল, তা শুধু বর্তমানে পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে আমরা যা ধারণা করতে পারছি তার সম্বন্ধেই। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহন যন্ত্রে উত্তাপ সরবরাহ করা। এ ছাড়া আরও কতদিকে যে পারমাণবিক ধারণা প্রসারিত হবে তা এখনও জানি না। মোর্স যখন প্রথম বেতারের মাধ্যমে তাঁর বিখ্যাত বাণী, 'ভগবান কি করলেন?' পাঠান, তখন রাডার বা বেতার-বীক্ষণ কে কল্পনা করেছিলেন? আমাদের পারমাণবিক ক্ষেত্রে চরম অধ্যবসায়

প্রয়োগ করার আর কোন কারণও যদি না থাকে তা' হলেও এর অজ্ঞাত অথচ প্রলোভনযুক্ত ভবিষ্যৎই আমাদের সেই পরিণতির দিকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে যাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা : মানুষের সেবক

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সদস্য হওয়ার কিছুদিন পরেই কমিশনের সদর দপ্তরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের কথা আমার মনে পড়ে। সম্মেলনটি আহ্বান করা হয়েছিল পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচীর উপজাত দ্রব্য তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার (আইসোটোপ) নানা হিতকারী গুণের কথা সংবাদপত্রসেবীদের নিকট প্রকাশ করার জন্য। অবশ্য কমিশনের সদস্য হিসেবে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন থাকলেও নূতন কমিশনার হিসেবে তখন আমার বিশেষ কিছু বলবার ছিল না। সংবাদপত্রসেবীদের প্রশ্নমালার উত্তর দেবার জন্য কমিশনের কর্মচারী অনেক বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। আমার পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই বাঞ্ছনীয় ছিল, কারণ পরমাণুকণিকা (আইসোটোপ) সম্বন্ধে তখন আমি বিশেষ কিছু জানতাম না। সুতরাং বিজ্ঞানীদের মুখ থেকে শুনে শিখবার এই সুযোগটাকে আমি স্বভাবতই স্বাগত জানিয়েছিলাম।

প্রথম প্রশ্নটি আমার আজও মনে আছে। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করে

বসলেন, 'আইসোটোপ বা পরমাণুকণিকা বস্তুটি ঠিক কি ব্যাপার?' তখন এক দীর্ঘ আলোচনা শুরু হ'ল। পারমাণবিক গুরুত্ব, পারমাণবিক ভর, নিউট্রন, প্রোটন, পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের গঠন, মৌলিক পদার্থসমূহের পর্য্যায়গত বিভাগ ইত্যাদি কত কথাই উঠল। একখানা বোর্ড আসল, তার উপর সাদা, কালো বৃত্ত এঁকে পরমাণুর অংশগুলি দেখানো হ'ল। এই সুদীর্ঘ আলোচনার সময় সাংবাদিকগণের প্রশ্নের উত্তরে অনেক খুঁটিনাটি কথাও বিজ্ঞানীরা বললেন।

অবশেষে প্রশ্নবর্ষণ ক্ষান্ত হ'ল। যে বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। তবু বিষয়টির জটিলতা বিবেচনা করে তাঁরা কারো যদি আরও কোন সন্দেহ থাকে তা নিরসনের জন্য শেষ একটি বা দু'টি প্রশ্ন আহ্বান করলেন। এই আহ্বানে সাড়া দিলেন সেই ভদ্রলোক, যিনি প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি চিন্তাকুলভাবে সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'সবই বুঝলাম, কেবল একটা ছোট জিনিষ ঠিক ধরতে পারছি না। আইসোটোপ বা পরমাণুকণিকা আসলে কি?'

আইসোটোপ কি সে সম্বন্ধে ভালো ধারণা না থাকাতেই, বোধ হয়, পারমাণবিক শক্তি বিকাশের প্রথম থেকেই তা' যে মানুষের কত কাজে আসছে, সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জানা নেই। আসলে পরমাণুর ইতিহাসে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার (আইসোটোপ) গল্পই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময়। তাদের সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা হয়, রোগের সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়, শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতি হয়, শস্য ও পশুর প্রজনন বৃদ্ধি হয় এবং মানুষের দেহ ও অন্যান্য প্রাণী ও বহির্জগতের নানা তথ্য জানা যায়। পরমাণুকণিকার (আইসোটোপ) ক্ষেত্রে নীতিগত কোন জটিলতা নেই এবং ভবিষ্যতের শুভফলের জন্য অপেক্ষা করার কথাও ওঠে না। তারা বর্ত্তমানেই আমাদের জীবনযাত্রা কত অভিনব উপায়ে উন্নততর করছে, তা অল্পলোকেই জানে।

আসলে আইসোটোপ কি? যে প্রশ্নের উত্তর অন্য অনেকে পরিষ্কারভাবে

দিতে পারেননি, তা' যে আমিই পারব সে সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ হয়। সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা আমার যা জানা আছে তা হ'ল, 'আইসোটোপ অপর একটি বস্তুর সঙ্গে সকল বিষয়ে সদৃশ অথচ ভিন্ন'। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে ইহা শুধু বাক্‌চাতুরী, এতে কোন জিনিষই পরিষ্কার হয়নি। তবু এই সংজ্ঞা থেকেই হয়ত অর্থ বার করা যায় যদি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখা যায়।

পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের জীবনযাত্রার শুরু থেকেই সে বস্তুসমূহকে চিনে আসছে। সে যার দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয় সেই বায়ুকে, যা পান করে সেই জলকে, আহার্য্য হিসেবে যাকে ব্যবহার করেছে সেই সকল বৃক্ষ ও জন্তুকে সে চিনেছে, কাঠ ও কয়লা যা জ্বালিয়েছে, পাথর ও মাটি যার দ্বারা সে আশ্রয় সৃষ্টি করেছে, লবণ যার দ্বারা সে তার খাদ্যকে সুস্বাদু করেছে, এ সবই সে চিনেছে। কালক্রমে সে শিখল যে, এই বিভিন্ন বস্তুগুলি অল্পসংখ্যক কতিপয় মূল পদার্থদ্বারা গঠিত, যেমন জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা গঠিত, লবণ সোডিয়াম ধাতু ও ক্লোরিণ গ্যাস দ্বারা গঠিত, যদিও ঐ সকল মূলবস্তুর কোন গুণই জল বা লবণে নেই। অবশেষে মানুষ আবিষ্কার করল যে, পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তা ৯২টি মূল পদার্থের সংযোগে সৃষ্ট। এই ৯২টি মূল পদার্থ খাঁটি জিনিস, ইহারা আর কোন পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়। এই বস্তুগুলিকে 'মৌলিক পদার্থ' বলে। এই ৯২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেন, কার্ব্বন ও অক্সিজেনের মত হাল্কা জিনিষ, রৌপ্য, লৌহ ও দস্তার মত অপেক্ষাকৃত ভারী আবার স্বর্ণ, ও ইউরেনিয়াম ও সীসার মত অতি গুরু দ্রব্য আছে।

অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা ভাবতাম এই ৯২টি মৌলিক পদার্থের প্রত্যেক অংশই একেবারে সমান, হাইড্রোজেনের ক্ষুদ্রতম অংশ ও হাইড্রোজেনের অন্য যে কোন অংশের সঙ্গে একান্তভাবে সদৃশ। ইউরেনিয়ামের যে কোনও টুকরা তা'র অন্য যে কোন টুকরার সঙ্গে রাসায়নিক গুণে একবারে সদৃশ। এরূপ ভাববার যথেষ্ট কারণ ছিল। রাসায়নিক পরীক্ষায় হাইড্রোজেন বা ইউরেনিয়াম যে উৎস

থেকে যতটুকুই ব্যবহার করা যাক একই গুণের বিকাশ সর্ব্বদাই পাওয়া যেত। ৯২টি মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই একথা খাটত।

কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে কোন কোন ক্ষেত্রে একই মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুতে প্রভেদ আছে। যেমন সব হাইড্রোজেনের পরমাণু আর সব হাইড্রোজেন পরমাণুর মত সমান নয় এবং সকল স্বর্ণ, রৌপ্য, অক্সিজেন ও ইউরেনিয়াম পরমাণুই অন্য সকল স্বর্ণ, রৌপ্য, অক্সিজেন ও ইউরেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে সমান নয়। প্রধানতঃ প্রভেদ থাকে ভারের মধ্যে। কোন পরমাণু অন্য পরমাণুর অপেক্ষা ভারী বা হাল্কা। কিন্তু কোন কোন মৌলিক পদার্থে পরমাণুর মধ্যে তফাৎ থাকে তেজস্ক্রিয়তার গুণে। একই মৌলিকের কোন কোন পরমাণু এক্সরের মত রশ্মি বিকিরণ করে, কোন কোন পরমাণু করে না। যে সকল পদার্থ এই প্রকার রশ্মি বা যাকে কখন কখনও 'পারমাণবিক ছটা' বলা হয়, তা বিকিরণ করে, তাদের 'তেজস্ক্রিয়' বলা হয়। সবচেয়ে খ্যাত তেজস্ক্রিয় পদার্থ হ'ল রেডিয়াম।

যে ৯২টি মূল পদার্থ দ্বারা পৃথিবী গঠিত তাহাকে যখন 'মৌলিক উপাদান' নাম দেওয়া হয়েছে, তখন সেই মৌলিক উপাদানের মধ্যে যে ভিন্ন ধরণের পদার্থ আবিষ্কৃত হ'ল তার জন্য নূতন নামের প্রয়োজন হ'ল। যে নামটি বেছে বার করা হ'ল তা হচ্ছে 'আইসোটোপ' বা পরমাণুকণিকা। আইসোটোপ কথাটি গ্রীক ভাষা থেকে গৃহীত। 'আইসো' মানে সম ও 'টোপোস' মানে স্থান। নামটি ১৯১৩ সালে তৎকালীন একজন নেতৃস্থানীয় ব্রিটিশ পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রেড্‌রিক সডি প্রস্তাব করেন।

কাজেই এখন আমরা দেখছি যে, আইসোটোপ বাস্তবিক পক্ষে এমন একটা জিনিস 'যা আর একটি জিনিসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সদৃশ অথচ ভিন্ন'। স্বর্ণের আইসোটোপ স্বর্ণই কিন্তু ঠিক অন্য সকল স্বর্ণের মত নয়। সোডিয়ামের আইসোটোপ সোডিয়ামই, কিন্তু অন্য সোডিয়ামের সঙ্গে ঠিক এক নয়। আই-

সোটোপটি যদি তেজস্ক্রিয় না হয়, তাহলে সেই পদার্থের অন্য অংশে তাকে পৃথক করে চিনতে অত্যন্ত জটিল অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু তেজস্ক্রিয় হলে 'গাইগার কাউন্টারের' মত যন্ত্রদ্বারা অন্যান্য নিউক্লিয়ার বিচ্ছুরণের মত একেও ধরা যায়।

সাধারণতঃ আইসোটোপটিকে ব্যক্ত করার জন্য একটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। সংখ্যাটি পরমাণুটির কেন্দ্রে যতগুলি কণা আছে তারই সূচক। যেমন হাইড্রোজেন-১এর কেন্দ্রে একটি মাত্র কণা আছে, হাইড্রোজেন-২এ দুটি আছে, আর হাইড্রোজেন-৩এ তিনটি কণা আছে। এইভাবে অক্সিজেন ১৬, ১৭ ও ১৮ এবং ইউরেনিয়াম ২৩৩, ২৩৭, ২৩৫ এবং ২৩৮ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ই সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কেননা আগেই দেখেছি যে প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে একমাত্র ইহারই পরমাণু এমনভাবে গঠিত যে ইহাকে বিভক্ত করা যায়। ইউরেনিয়াম ২৩৩ও বিভাজনশীল, কিন্তু প্লুটোনিয়ামের মত উহা মনুষ্যসৃষ্ট।

যে সকল আইসোটোপ তেজস্ক্রিয়, তাদের রেডিও-আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা বলে। (কতকগুলি রেডিও-আইসোটোপ অন্যদের অপেক্ষা বেশী সময় তেজস্ক্রিয় থাকে। কোনটি সহস্র কোটি বছর স্থায়ী হয়, আবার কোনটি এক সেকেণ্ডেরও কম সময় থাকে। রেডিও-আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়া যে সময়ের মধ্যে অর্দ্ধেক হয়ে যায় তাকে তার অর্দ্ধ জীবন বলে।) গবেষণার কাজে এই রেডিও-আইসোটোপগুলি খুবই মূল্যবান, কেননা এদের অস্তিত্ব সহজেই গাইগার কাউন্টারের মত যন্ত্রে ধরা পড়ে। কোন কোন রেডিও-আইসোটোপের এক গ্রামের লক্ষ কোটি ভাগের লক্ষ কোটি ভাগও এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। কাজেই, কোনও মৌলিক পদার্থের অনেকখানি অংশের মধ্যে ঐ পদার্থের অতি সামান্য পরিমাণ রেডিও-আইসোটোপ যদি মিশ্রিত করা যায় তাহলে কোন জৈবিক বা শৈল্পিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ঐ মৌলিক পদার্থটির গতিবিধি ঐ

প্রকারের যন্ত্রদ্বারা যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। জৈবিক শৈল্পিক প্রক্রিয়াকে কোনরূপ ব্যাহত না করে এই প্রকার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা ইতিহাসে এই প্রথম মানুষের হাতে আসল। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডাঃ মেলভিন ক্যালভিনের ভাষায় 'বিজ্ঞানীরা এমন এক চক্ষুর অধিকারী হয়েছেন যার দ্বারা উদ্ভিদকোষের মধ্যে নজর চলে এবং সেখানকার জৈবিক প্রণালীগুলি চাক্ষুষ হয়।' তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলি কিভাবে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে তা এ থেকেই বোঝা যাবে যে, অঙ্গার-১৪র (অঙ্গারের একটি রেডিও-আইসোটোপ) এক গ্রামের এক লক্ষ ভাগ যদি বিশ হাজার গিনিপিগের পেশীর মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও তাদের সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়।

১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত রেডিয়াম ও তার ফলজাত বস্তুগুলিই মাত্র যথেষ্ট তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা বা রেডিও-আইসোটোপ বলে জানা ছিল যাকে কাজে লাগানো চলত। প্রায় সকলেই জানেন যে রেডিয়াম রশ্মিকে বহুল পরিমাণে ক্যানসারের চিকিৎসায় ও ঘড়ির ডায়ালকে দীপ্ত করার জন্য যে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ লাগে তাদের সক্রিয় করার জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু জৈবিক বা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া সন্ধান করার জন্য এরা বিশেষ কাজে আসত না, কেননা এই সকল প্রণালীগুলির মধ্যে রেডিয়ামের বিশেষ স্থান ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল থোরিয়াম, ফসফরাস, আইওডিন, লৌহ, গন্ধক-এর মত সাধারণ ও বহু ব্যবহৃত বস্তুগুলির রেডিও-আইসোটোপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদের রেডিও-আইসোটোপ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না।

প্রথম অপ্রাকৃত রেডিও আইসোটোপ প্রস্তুত হয় ১৯৩০ সালের পরে সাইক্লোট্রোন নামে বিপুলাকার পরমাণু চূর্ণকারী যন্ত্রের সাহায্যে। সাইক্লোট্রোন এমন একটি যন্ত্র যার দ্বারা অতি ক্ষুদ্র পারমাণবিক কণাগুলিকে রাইফেলের গুলীর মত বিবিধ মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস অর্থাৎ পারমাণবিক কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারা যায়। এই কণাগুলি এক এক সময় ওই পারমাণবিক

কেন্দ্রকে এত জোরে আঘাত করে যে খানিকটা ভেঙ্গে গিয়ে বাকী কেন্দ্রটি পুনর্গঠিত হয়। অর্থাৎ বিদ্ধ মৌলিক পদার্থটি অন্য একটি মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই সেই 'মৌলিকপরিবর্ত্তন প্রণালী' যার দ্বারা প্রাচীন রাসায়নিকরা লৌহকে স্বর্ণ করার স্বপ্ন দেখতেন। আমরা তাঁদের স্বপ্নের অতীত সাফল্য লাভ করেছি, কেননা এখন আমরা সাধারণ এমন জিনিষে মৌলিক পদার্থকে পরিবর্ত্তিত করতে পারি যা স্বর্ণের অপেক্ষা বেশী মূল্যবান।

সাইক্লোট্রোন উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে গবেষকরা এমন যন্ত্র প্রস্তুত করতে পারলেন যার দ্বারা তারা বিশেষ বিশেষ পরমাণুকে বহু বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হলেন এবং এর জন্য কোন জৈবিক প্রণালীকে ব্যাহত করতে হ'ল না। এর উপরে কতকগুলি রেডিও আইসোটোপকে এক্স-রে বা রেডিয়ামের মত নিউক্লিয়ার তেজস্ক্রিয়ার উৎসস্বরূপ ব্যবহার করা যায়, যে তেজস্ক্রিয়া কঠিন বস্তু ভেদ করে অসুস্থ কলাকে নষ্ট করতে পারে।

একমাত্র অসুবিধা ছিল এই যে, যথেষ্ট রেডিও-আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা পাওয়া যেত না। পরমাণু চূর্ণকারী যন্ত্রগুলি রেডিও আইসোটোপ অতি সামান্য পরিমাণে সৃষ্টি করতে পারত। পরমাণুর মধ্যে অনেকখানিই শূন্য, কাজেই সাইক্লোট্রোন ক্ষিপ্ত পারমাণবিক কণাগুলির নিউক্লিয়াসকে আঘাত করার সম্ভাবনা বড় কম। অতি অল্প সংখ্যক গবেষকরাই রেডিও আইসোটোপ পেতে সমর্থ হতেন এবং যাঁরা পেতেন তাঁরাও পরিমিত সংখ্যক পরীক্ষায় এইগুলি ব্যবহার করতে পারতেন।

এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরেনিয়াম-২৩৫ নামক পরমাণুতে পারমাণবিক আবৃত্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে সমর্থ হ'ল। এই আবৃত্ত প্রতিক্রিয়া একবার সৃষ্টি হ'লে আপনা-আপনি চলতে থাকে। এই ঘটনার পর পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী পরিমাণে ও অনেকগুণ কম খরচায়

রেডিও-আইসোটোপ তৈরী করা সম্ভব হ'য়ে উঠল। সাইক্লোট্রোনস্থিত পরমাণুকে যতখানি কণার আঘাত সহ্য করতে হয়, পারমাণবিক রি-অ্যাক্টরের মধ্যে কোন বস্তু থাকলে তার পরমাণুগুলিকে উহার অপেক্ষা অনেক বেশী আঘাত সহ্য করতে হয়। রি-অ্যাক্টরের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রতি সেকেণ্ডে বহু লক্ষ কোটি নিউট্রন প্রবাহ চলতে থাকে এবং এই নিউট্রন প্রবাহ বহু ইউরেনিয়াম ও গ্রাফাইটের মধ্যে চলে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর দশ হাজার ডলার খরচায় ততখানি তেজস্ক্রিয় অঙ্গার তৈরী করতে পারে যতখানি এক হাজার সাইক্লোট্রোন প্রায় দশ কোটি ডলার ব্যয়ে তৈরী করতে পারত। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে ওকরিজ জাতীয় বীক্ষণাগারের রি-অ্যাক্টর যে পরিমাণ রেডিও-আইসোটোপ তৈরী করেছে তা ঐ একই সময়ে পঞ্চাশটি সাইক্লোট্রোনের মোট শক্তির প্রায় চারশত গুণ।

'ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্টের' (১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এই গোপন সামরিক সংগঠনটি গড়ে তোলেন পারমাণবিক শক্তির বিকাশ সাধনের জন্য) কর্ম্মচারীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পারমাণবিক শক্তি উন্নয়নের একটি বহু মূল্যবান উপজাত দ্রব্য হ'ল এই রেডিও-আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা। পারমাণবিক শক্তি কর্ম্মসূচীর যুদ্ধকালীন গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ যখন একটু হাল্কা হ'ল, তখন 'ম্যানহাটান' ডিস্ট্রিক্ট তাদের রি-অ্যাক্টর জাত তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা (রেডিও-আইসোটোপ) বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিতরণ করতে আরম্ভ করলেন। পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং একে সম্প্রসারিত করেছেন যাতে এখন প্রায় একশতাধিক বিভিন্ন প্রকারের তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা (রেডিও-আইসোটোপ) পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সাল থেকে এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের প্রায় এক সহস্র প্রতিষ্ঠানে কমবেশী পঁয়ত্রিশ হাজার চালান তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা (রেডিও-আইসোটোপ) পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া আরও

একত্রিশটি দেশের আড়াইশত প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে প্রায় দু'হাজার চালান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্লুটোনিয়াম তৈরীর জন্য ওকরিজ জাতীয় বীক্ষণাগারে যে রি-অ্যাক্টরটি (এটি বায়ুদ্বারা শীতল করা হয় এবং প্রশমক হিসেবে এতে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়) নির্মিত হয় তা থেকেই কমিশন কর্তৃক বিতরিত তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার বেশীর ভাগ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। রেডিও-আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার উৎপাদন খরচের হিসেবেই তার মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়। কিন্তু ক্যানসার রোগের গবেষণায়, রোগ-নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় যে সকল তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা ব্যবহৃত হয় তা দেওয়া হয় মাত্র খরচার এক পঞ্চমাংশ দামে। তেজস্ক্রিয় নয় এমন আইসোটোপও ওকরিজে অল্প মাত্রায় তৈরী হয়। যদিও এগুলি রেডিও-আইসোটোপের মত গবেষণা সহায়ক বহুমুখী উপকরণ নয়, তথাপি তারা কোনও কোনও গবেষণায় খুব ব্যবহারে লাগে, বিশেষ ভাবে যদি এমন কোনও মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যার নিজস্ব রেডিও-আইসোটোপ নেই। ১৯৪৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ওকরিজ থেকে তেজস্ক্রিয়তাহীন আইসোটোপের প্রায় দু'হাজার চালান পাঠানো হয়েছে।

রি-অ্যাক্টর থেকে তিন প্রকার রেডিও-আইসোটোপ তৈরী করা হয়। সব প্রণালীতেই নিউক্লিয়ার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হবার পর যে প্রচুর পরিমাণে নিউট্রন প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকেই কাজে লাগানো হয়। কোনও রি-অ্যাক্টরে স্থাপিত মৌলিক পদার্থের পরমাণুসমূহের নিউক্লিয়াসগুলি যদি বহমান নিউট্রনকে শোষণ করে নেয়, তা'হলে ঐ মৌলিক পদার্থে ভারী আইসোটোপের সৃষ্টি হয়। আর ঐ মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের উপর নিউট্রন ক্ষেপনের দ্বারা যদি খানিক টুকরো ভেঙ্গে যায় তা'হলে অন্য একটি মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। আর ইউরেনিয়াম-২৩৫এর নিউক্লিয়াস অর্থাৎ

পারমাণবিক কেন্দ্র যদি নিউট্রন দ্বারা আহত হয়, তা'হলে ঐ কেন্দ্র ভেঙে দু'খণ্ড হয়ে যায়। প্রত্যেকটি একটি হাল্কা মৌলিক পদার্থের রেডিও-আইসোটোপে পরিণত হয়। শেষোক্ত প্রণালীতে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কণিকা বা রেডিও আইসোটোপকে পরমাণু বিভাজনজাত দ্রব্য বলে।

পারমাণবিক শক্তি কমিশন দ্বারা বিতরিত তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকাগুলি (রেডিও-আইসোটোপ) বেশীর ভাগই জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণায় ও রোগনির্ণয়ে ও রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় এগুলিকে দেহের বিভিন্ন প্রণালীর ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সন্ধানী পরমাণুরূপে ব্যবহার করা হয়। এই প্রকার গবেষণায় রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সঙ্গে তেজস্ক্রিয়-পরমাণুকণিকা (রেডিও-আইসোটোপ) মিশিয়ে মানুষের বা জন্তুর মধ্যে ছুঁচ দ্বারা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। জৈবিক প্রক্রিয়াতে যে সকল যৌগিক পদার্থ লাগে তার কতকগুলি বীক্ষণাগারের প্রয়োজনে লাগে, কিন্তু অন্যগুলি জীবদ্বারা বা উদ্ভিদদ্বারাই প্রস্তুত হয়।

অঙ্গার ও অক্সিজেনের যোগে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হয়। উদ্ভিদের জীবনধারণের পক্ষে এই গ্যাস একান্ত প্রয়োজনীয়। বায়ুতে এই গ্যাস থাকে, উদ্ভিদরা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে এই গ্যাস গ্রহণ করে। তেজস্ক্রিয় কার্বন থেকে প্রস্তুত কার্বন ডাই-অক্সাইড সাধারণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে সেই মিশ্রিত গ্যাসের মধ্যে খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহার্য নানা ধরণের উদ্ভিদ জন্মিয়ে নিলে সেই উদ্ভিদসমূহ থেকেই গবেষণার উপযোগী সর্বাপেক্ষা ভালো রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়। ঐ উদ্ভিদগুলি তাদের কোষে তেজস্ক্রিয় কার্বন গ্রহণ করে এবং ফলে সেই উদ্ভিদ থেকে যে সমস্ত বস্তু নিষ্কাশিত হয়, তারা তেজস্ক্রিয়তার জন্য একেবারে 'চিহ্নিত' হয়ে যায়। আবার ঐসব বস্তু যখন জন্তুদের খাওয়ানো হয়, তখন সেইসব জন্তুদের রক্ত, মূত্র ও টিস্যু বা কলা থেকে নিষ্কাশিত বস্তুগুলিও তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে যায়।

শর্করা, জৈব অম্ল, অ্যামিনো অম্ল, শ্বেতসার, প্রোটিন, রং ও অ্যালকালয় প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ এভাবে তেজস্ক্রিয়া-চিহ্নিত হয়। এভাবে অনেকগুলি চিহ্নিত ওষুধ তৈরী হয়েছে, যেমন যে ওষুধ থেকে ডিজিট্যালিস তৈরী হয়, সেই ওষুধটিকে তেজস্ক্রিয় কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিশ্রিত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে জন্মালে তা থেকে যে ডিজিট্যালিস প্রস্তুত হয় তাও তেজস্ক্রিয় হয়।

জৈব প্রক্রিয়া অনুশীলনের পক্ষে এ ধরণের তেজস্ক্রিয় যৌগিক পদার্থের মূল্য খুব বেশী। যখন ওষুধগুলি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে যায় তখন তেজস্ক্রিয় রশ্মিদ্বারা তাদের প্রায় গোচর হয় এবং তাদের সঠিক প্রক্রিয়া বোঝা যায়। প্রোটিন, নিউক্লিও-প্রোটিন, এনজাইম প্রভৃতি বস্তুর মধ্যে যে সকল বৃহৎ জটিল অণু থাকে তাদের জৈব প্রক্রিয়ায় যে স্থান তা আগের চেয়ে সঠিকভাবে এখন বোঝা যায়। যে সকল যৌগিক পদার্থ দ্বারা ক্যানসার রোগের সৃষ্টি হয়, তাদের সন্ধান করা যায় এবং ক্যানসারগ্রস্ত কোষ সাধারণ কোষের প্রভেদ ধরা যায়। এসব ক্ষেত্রে শত শত পরীক্ষা হচ্ছে—অ্যামিনো এসিড থেকে খাদ্যশক্তি দ্বারা কিভাবে দেহের মধ্যে প্রোটিন তৈরী হয় তা বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য রেডিও-কার্ব্বন ব্যবহার করা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় কার্ব্বন ও তেজস্ক্রিয় লৌহ দ্বারা পরীক্ষা করে রক্তাল্পতা ও বহু-মূত্র রোগের অনেক রহস্য বোঝা গিয়েছে। তেজস্ক্রিয় দস্তা ব্যবহার করে গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে লিউকোমিয়া নামক রোগে শ্বেত রক্তকোষ-গুলির মধ্যে দস্তার অভাব থাকে। ঐ রোগে কেন শ্বেত রক্তকোষ অস্বাভাবিক-রূপে বৃদ্ধি পায় তাও ক্রমশঃ বোঝা যাবে।

গবেষকগণ সন্ধানী পরমাণুকণিকা ব্যবহার করে সজীব দেহের যে চিত্র দেখতে পাচ্ছেন তা সাধারণতঃ আমরা তাকে যেরূপ স্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় বলে মনে করি তা থেকে ভিন্ন। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, এমন কি অস্থি ও দন্তের মত কঠিন জিনিষও সর্ব্বদা ক্ষয় ও সৃষ্টির

চলমান প্রক্রিয়ার আধার। এ সকল প্রক্রিয়া আশ্চর্যজনক বেগের সঙ্গে ঘটতে পারে। একটি শিরার মধ্যে লবণ প্রবেশ করিয়ে দিলে ঐ লবণ শিরার প্রাচীর ভেদ করে ঘর্মগ্রন্থিতে গিয়ে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে ঘামের সঙ্গে চামড়ার বাইরে দেখা দেয় এক মিনিটের কম সময়ের মধ্যে। আমরা তেজস্ক্রিয় চিহ্ন দ্বারা এই প্রক্রিয়াটিকে পর্যবেক্ষণ করে সঠিক সময় নির্ণয় করেছি।

জৈব রসায়নে যে সকল জটিল যৌগিক পদার্থের ব্যবহার হয় তাদের সঠিক ভূমিকা বুঝতে পারলে ক্যানসার সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা। যে বিপুলকায় নিউক্লিও-প্রোটিন অণুগুলিকে জৈব ও অজৈব পদার্থের মাঝামাঝি কোনও পদার্থ বলা যায় তাদের সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে এটি বিশেষভাবে সত্য। ক্যানসার রোগ আসলে জীবকোষের রোগ। এবং যখন জীবকোষের নিউক্লিও-প্রোটিন অণুগুলি অল্পজ্ঞাত বা অজ্ঞাত হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খলভাবে বেড়ে যেতে থাকে, তখনই সম্ভবতঃ ক্যানসার রোগ হয়। নিউক্লিও-প্রোটিনের বিবিধ অংশ-সমূহকে চিহ্নিত করে তার দ্বারা পরীক্ষা করলে ক্যানসার রোগ উৎপাদনে তাদের ভূমিকা ভালো করে বোঝা যাবে। যদি কখনও ক্যানসারকে মানুষ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তা হবে। সম্ভবতঃ জৈবপ্রক্রিয়া ও কোষসমূহের উচ্ছৃঙ্খল বৃদ্ধি সংক্রান্ত এই সকল দীর্ঘকালব্যাপী শ্রমসঞ্জাত পরীক্ষাসমূহ থেকেই হবে।

ইতোমধ্যে ক্যানসার ও অন্যান্য রোগের নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় রেডিও আই-সোটোপ বা তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যখন রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন তারা এত সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, যাতে দৈহিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তবে পরমাণুকেন্দ্রজাত সকল রশ্মিই জীবকোষের ক্ষতি করে এবং রুগ্ন কলাকে ধ্বংস করতে এই গুণ বা দোষ খুবই সুবিধাজনক। এরজন্য রেডিও-আইসোটোপকে বাইরে থেকে এক্স-রে'র মত ব্যবহার করা চলে অথবা দেহাভ্যন্তরে তাদের প্রয়োগ করা চলে মুখদ্বারা সেবন করে অথবা টিউমার বা দেহাভ্যন্তরস্থ ক্ষতস্থানে সূচীবিদ্ধ করে।

রোগনির্ণয়ে সর্বাপেক্ষা উপকারী তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা হ'ল রেডিও-আইয়োডিন বা তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন এবং রেডিও ফসফোরাস্ বা তেজস্ক্রিয় ফসফোরাস। সাধারণ আইয়োডিনের মতই তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন কণ্ঠগ্রন্থিতে সঞ্চিত হয়। কোন রোগী জলে দ্রবীভূত তেজস্ক্রিয়-আইয়োডিন পান করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই আইয়োডিনের অর্দ্ধেকের বেশী কণ্ঠগ্রন্থির কয়েক আউন্স পরিমাণ কলার মধ্যে একত্রিত হবে। ক্যানসারগ্রস্ত গ্রন্থি ততখানি আইয়োডিন সঞ্চয় করতে পারে না, যতখানি সুস্থ গ্রন্থি পারে। আবার যেসব গ্রন্থি অতি ক্রিয় তারা সুস্থ গ্রন্থির চেয়ে বেশী সঞ্চয় করবে। তেজস্ক্রিয় আইয়োডিনের সন্ধানী মাত্রা প্রয়োগে কণ্ঠগ্রন্থির সুস্থতা নিরূপণ করা যায়। আর একটু বেশী মাত্রা প্রয়োগ করলে ক্যানসার আক্রান্ত কোষগুলির প্রজনন বন্ধ করা যেতে পারে।

যেহেতু ক্যানসারগ্রস্ত কণ্ঠগ্রন্থি সুস্থগ্রন্থি অপেক্ষা কম পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন সংগ্রহ করে, সেহেতু থাইরয়েড ক্যানসারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন আশানুরূপ সফল হয়নি। তবে থাইরয়েড থেকে দেহের অন্যান্য অঞ্চলে সংক্রমণকারী ক্যানসারগ্রস্ত টিসু বা কলার টুকরাকে অনুসরণ করা এবং ইণ্ড্রিয়ে তার বৃদ্ধি নিবারণ করার জন্য এই আইয়োডিন খুবই কাজে আসছে। রুগ্ন গ্রন্থি অস্ত্রোপচার দ্বারা অপনীত করলে এইসকল টুকরোগুলি অধিকমাত্রায় আইয়োডিন সংগ্রহ করতে পারে। তাতে তারা তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন চিকিৎসার কবলে এসে যায়। এভাবে চোয়ালের এবং ফুসফুসের ক্যানসারগ্রস্ত টিউমারের চিকিৎসা হয়েছে।

কয়েকমাস আগে বার্কলেতে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ 'গামারশ্মি বীক্ষক' নামে এক সন্ধান প্রণালী উদ্ভাবন করেছেন; এই গামা-রশ্মি বীক্ষককে তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন সহযোগে ব্যবহার করলে দেহের বিভিন্ন স্থানে কণ্ঠগ্রন্থিতে ক্যানসারজনিত বিকারের সন্ধানের কাজে লাগানো যায়। একটি

চলমান যন্ত্রের মধ্যে ছোট ছোট রশ্মি-সন্ধানী যন্ত্রকোষ থাকে। এগুলির সাহায্যেই দেহের বিভিন্ন স্থানের তেজস্ক্রিয়তা ফটো তোলার ফিল্মের উপর বিন্দুর আকারে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। শায়িত রোগীর দেহের উপর দিয়ে যন্ত্রটিকে চালিয়ে নিয়ে গেলে, রোগীর একটা বিন্দুময় প্রতিকৃতি ফিল্মের উপর উঠে যায়। তা দেখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করা যায়।

অতিক্রিয় কণ্ঠগ্রন্থির চিকিৎসাতেই বোধ হয় তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন অধিকতম কৃতকার্য্য হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা (রেডিও-আইসোটোপ) থেকে 'বিটা রশ্মি' নামক স্বল্পপ্রসারী রশ্মিসকল নির্গত হয়ে যথেষ্ট সংখ্যক কোষকে বিনষ্ট করলে অতিক্রিয়া প্রশমিত হয়ে যায়। অথচ রশ্মিগুলি স্বল্প-প্রসারী হওয়ায় এদের ক্রিয়া গ্রন্থির গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ও অন্যান্য সুস্থ কোষকে বিনষ্ট করতে পারে না। এই প্রণালীতে চিকিৎসা করে অ্যাইজাইনা পেকটোরিস ও অনুরূপ হৃদ্‌রোগে উপকার পাওয়া গিয়েছে। কণ্ঠগ্রন্থির (থাই-রয়েড) ক্রিয়া প্রশমিত হলে দৈহিক প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে আসে ও তাতে রুগ্ন হৃদ্‌যন্ত্রের উপর চাপ কম পড়ে।

তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফোরাসও রোগনির্ণয়ের কাজে সাহায্য করে। এই বস্তুটি মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কয়েক শ্রেণীর টিউমারের অস্তিত্বের সন্ধান করে দিয়ে অস্ত্রচিকিৎসকদের অস্ত্রোপচারের মূল্যবান উপকরণে পরিণত হয়েছে। এ সকল টিউমার মস্তিষ্কের সাধারণ কলা অপেক্ষা অনেক বেশীগুণ ফস্‌ফোরাস সংগ্রহ করে এবং 'চিহ্নিত' ফস্‌ফোরাস রোগীর শিরায় সূচীবিদ্ধ করলে তারা ত্বরায় টিউমারগুলির মধ্যে জমতে থাকে। রেডিও-ফস্‌ফোরাস থেকে বিকীর্ণ রশ্মি মাত্র সিকি-ইঞ্চি কলা ভেদ করতে পারে, কাজেই সেগুলির খোঁজ করার জন্য একটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়, যার একটি সূচের মত অংশকে মস্তিষ্কের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া যায়।

মস্তিষ্কের টিউমার চিকিৎসার আর একটি আশাপ্রদ কৌশল উদ্ভাবিত

হয়েছে ব্রুকহ্যাভেন জাতীয় বীক্ষণাগারে। রোগীদের গাত্রে বোরোন-১০ সূচীর সাহায্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে অল্প কিছুক্ষণ পরে রি-অ্যাক্টর থেকে নির্গত নিউট্রন ধারার পথে উন্মুক্ত করা হয়। বোরোন প্রথমতঃ রুগ্ন কলাগুলির মধ্যে জমে এবং সেইখানেই নিউট্রনের আঘাতে বোরোন পরমাণুগুলি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। এ ভিন্ন পরমাণুর প্রত্যেকটি খুব তীব্র অথচ অল্পপ্রসারী রশ্মির সৃষ্টি করতে পারে। এই রশ্মিগুলি এক মিলিমিটারেরও কম দূরে যায়, কাজেই রুগ্ন কলার বাইরে তাদের প্রভাব পৌঁছায় না। শতকরা আশিটি রোগী এই চিকিৎসায় উন্নতিলাভ করেছেন।

তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফোরাস লসিকাতন্ত্রের ক্যানসারে ও লিউকেমিয়া নামক রোগে যাতে রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি ক্যানসারের মতই অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার চিকিৎসাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। এই চিকিৎসায় যে ঐ রোগগুলি একেবারে নিরাময় হয় তা নয়, তবে অনেক রোগীকে বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। কিন্তু রক্তের লাল কণিকার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি জনিত যে রোগ, যার নাম "পলিসাইথেমিয়া ভেরা" সেই রোগে তেজস্ক্রিয় ফসফোরাস খুবই কৃতকার্য হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন যেমন স্বতঃই কণ্ঠগ্রন্থিতে (থাইরয়েড) সঞ্চারিত হয়, ঠিক সেভাবে যদি অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পরমাণুকনিকা ক্যানসারযুক্ত প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয় তাহলে যে সকল ক্যানসারে অস্ত্রোপচার চলে না সেইসব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা চলে। অতএব গবেষকরা চেষ্টা করছেন এই প্রকারের তেজস্ক্রিয় 'নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র' উদ্ভাবনের জন্য। এই অস্ত্রগুলিকে 'অ্যান্টিবডি' বলে। শরীরের মধ্যে বাইরের পদার্থ ঢুকলেই তাদের প্রতিরোধ করার জন্য এই বস্তুগুলি আপনিই দেহের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এর কৌশল এরূপ। যদি কোন ছোট ইন্দুরের বৃক্ক কলা কোন বড় ইন্দুরের গাত্রে সূচীবিদ্ধ করা হয়, তা'হলে বড় ইন্দুরের দেহে তার প্রতিষেধক আপনিই সৃষ্টি হবে। এই বস্তুটিকে

বড় ইন্দুরের দেহ থেকে নিষ্কাশিত করে একটি তেজস্ক্রিয় বস্তুর দ্রব্যের মধ্যে রাখা হয়। উক্ত প্রতিষেধক শেষোক্ত তেজস্ক্রিয় বস্তুটিকে শুষে নেয়। এখন ওই অ্যান্টিবডিকে যদি কোন ছোট ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় তা'হলে সরাসরি উহা ঐ ইঁদুরটির বৃক্কে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তেজস্ক্রিয়তা সঙ্গে নিয়ে যায়।

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে স্লোআন-কেটারিং ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এই কৌশলের একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতির কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা ক্যানসার কোষের এ্যান্টিবডি উদ্ভাবনের কথা ব্যক্ত করেন। এরা সরাসরি দেহের মধ্য দিয়ে ক্যানসারগ্রস্ত অংশে চলে যায়। এই 'অ্যান্টিবডি'গুলিকে তেজস্ক্রিয় করা চলে। এগুলিকে যদি মনুষ্যদেহে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়, তা'হলে তাদের মারফৎ তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকাকে বিশেষ বিশেষ প্রকারের ক্যানসার-গ্রস্ত কলার মধ্যে চালনা করা যেতে পারে, যার অন্য কোনরূপ চিকিৎসার উপায় নেই।

এক্সরে যন্ত্র বা রেডিয়ামের মত বাইরে থেকে রশ্মি প্রয়োগ করার উৎস হিসেবে রেডিও-কোবাল্ট বা তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা। রি-অ্যাক্টর যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজেই এটি প্রস্তুত হয়। রেডিয়ামের অপেক্ষা অনেক সস্তা এবং এক্সরে অপেক্ষা এর ব্যবহারও সহজ। দেহের বিভিন্ন অংশে সুবিধামত প্রয়োগের জন্য একে বিভিন্ন আকারে নির্মাণ করা যায় অথবা ইহাকে সূচী বা পুঁতির আকারে প্রস্তুত করে রুগ্ন কলার মধ্যে সরাসরিভাবে স্থাপন করা যায়। এমন কি রেডিও-কোবাল্ট সংশ্লিষ্ট নাইলনের সূতাকেও ক্যানসারগ্রস্ত কলায় তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রক্ষেপ করার কাজে লাগানো হয়েছে। জিনিষটি সহজে নমনীয় হওয়ায় ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই এবং রেডিয়ামের চেয়ে সহজে এই রশ্মির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা চলে।

কয়েক প্রকার সুতীব্র রশ্মি বিকীরণকারী রেডিও-কোবাল্ট যুক্তরাষ্ট্রে

ঔষধার্থে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের মধ্যে এক একটি প্রায় দু'পাউণ্ড রেডিয়ামের বেশী রশ্মি দেয়। একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা এই যে, রেডিও-কোবাল্টের টুকরা এমনভাবে সাজানো যায় যে, তাদের রশ্মিগুলি ক্যানসারগ্রস্ত অংশের মধ্যে একত্রিত হয়। এরূপ অবস্থায় ক্যানসারগ্রস্ত অংশে তেজ প্রক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সুস্থ কলার উপর কোন প্রভাব হয় না। কানাডার অন্তর্গত অণ্টারিও প্রদেশে চক্ নদীতে যে রি-অ্যাক্টরটি আছে, তা থেকে খুব প্রয়োজনীয় সুতীব্র রশ্মি-বিস্তারী রেডিও কোবাল্ট পাওয়া যায়। এই রি-অ্যাক্টরটির তেজস্ক্রিয়া যে তীব্রতার কাজ করে তাতেই ইহা সম্ভব হয়। রি-অ্যাক্টরে পরমাণু বিভাজন-জনিত যে সকল পদার্থ পাওয়া যায় তার মধ্যে তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম একটি। এ জিনিষটি হয়ত ভবিষ্যতে রেডিও-কোবাল্টের চেয়েও তেজের উন্নততর উৎস হতে পারে, কেননা এর অর্দ্ধজীবন বেশী সময় স্থায়ী। কিন্তু রি-অ্যাক্টরে পরমাণু বিভাজন জনিত যে সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি হয় তা থেকে একে অধিক পরিমাণে বার করে আনবার উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

চিকিৎসায় ব্যবহৃত আর একটি রেডিও-আইসোটোপ হ'ল রেডিও-গোল্ড বা তেজস্ক্রিয় স্বর্ণ। সর্ব্বাপেক্ষা কম দামী রেডিও-আইসোটোপের মধ্যে এটি অন্যতম। দেহাভ্যন্তরে যে সকল গহ্বর আছে তার চারদিকের টিস্যু বা কলা যদি ক্যানসার রোগগ্রস্ত হয় ত প্রায়ই ঐ সকল গহ্বরে অত্যধিক তরল পদার্থ জমে। ঐ সকল গহ্বরে যদি তেজস্ক্রিয় স্বর্ণ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ত ব্যাহত হয়ই, উপরন্তু গহ্বরের সীমাস্থিত সুস্থ কোষগুলি থেকে অতিরিক্ত ক্ষরণও কমিয়ে আনে। তেজস্ক্রিয় স্বর্ণকে সরাসরি দুষ্ট টিউমারগ্রস্ত কলার মধ্যে সূচীবিদ্ধ করে প্রবেশ করানো যায়।

তবে ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার মূল্য সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা ঠিক নয়। যাঁরা পারমাণবিক কার্য্যসূচীতে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের কাছে এই কথাটি খুবই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যখন গত বছর

পারমাণবিক শক্তি আইনের প্রস্তাবক ও কংগ্রেসের পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত যুক্ত কমিটির সভাপতি সেনেটর ব্রায়ান ম্যাকম্যাহন ক্যানসার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সম্প্রসারণের জন্য তাঁর মত কেউই চেষ্টা করেননি, কিন্তু কোন রেডিও-আইসোটোপ অথবা ক্যানসার রোগের বিরুদ্ধে কোন অভিনব কৌশলই তাঁকে বাঁচাতে পারেনি।

তবে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা যে শুধু মনুষ্য ও জীবদেহেরই নানা নূতন তথ্য অনুশীলন করতে সাহায্য করে তা নয়, উদ্ভিদের জৈবিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য এরা আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেছে। উদ্ভিদ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক প্রক্রিয়া হ'ল ফোটোসিন্‌থিসিস্ বা সালোক-সংশ্লেষ। এই প্রক্রিয়াতেই উদ্ভিদ জল, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে কার্ব্বোহাইড্রেট প্রোটিন ও চর্ব্বি তৈরী করে ও অক্সিজেন গ্যাস ছেড়ে দেয়। সালোক-সংশ্লেষ থেকেই আমরা আমাদের সমস্ত খাদ্য, কয়লা ও তৈল পাই। তা ছাড়া, প্রতিনিয়ত জীবের নিঃশ্বাস গ্রহণে ও দহনকার্য্যের ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের যে ক্ষয় হয় এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদ তা পূরণ করে।

সালোক-সংশ্লেষের চরম পরিণতিতে যে সকল বস্তুর সৃষ্টি হয়, কিছুদিন যাবৎ আমরা তা জানতে পেরেছি। কিন্তু অতি সরল উপাদান থেকে কিভাবে কার্ব্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্ব্বির মত জটিল অণু প্রস্তুত হয় তা প্রকৃতির গুহ্যতম রহস্যের মধ্যে একটি। বর্ত্তমানে কিন্তু তেজস্ক্রিয়-কার্ব্বন থেকে প্রস্তুত কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা ঐ সকল জটিল প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। জৈব পুষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাদের মত সালোক-সংশ্লেষের ধাপগুলিও খুব দ্রুত অতিক্রান্ত হয়। সন্ধানী পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা গিয়েছে যে উদ্ভিদ দেহে রেডিও-কার্ব্বন প্রবেশ করবার দুই সেকেণ্ডের মধ্যে দু'টি-তিনটি যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এক মিনিটের মধ্যে প্রায়

পঞ্চাশটি যৌগিক তৈরী হয় এবং দু' মিনিটের মধ্যে প্রোটিন গঠনকারী জটিল অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে রেডিও-কার্ব্বন পাওয়া যায়। গবেষকগণ যদি এই সকল যৌগিককে চিনতে ও সংশ্লেষ করিতে পারেন তা'হলে প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থ ও শক্তি থেকে খাদ্য ও ইন্ধন সংশ্লেষ করা সম্ভব হতে পারে। এই একটি বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জিত হলে মানবসভ্যতা এমনভাবে বদলে যেতে পারে যা পারমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ, এরোপ্লেন ও বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য এক করলেও হবে না।

তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকাকে অন্যান্য উপায়ে ব্যবহার করে ও উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে আরও প্রত্যক্ষ উপকার পাওয়া যাচ্ছে। উদ্ভিদ কিভাবে সার ও অন্যান্য খাদ্য মাটি থেকে সংগ্রহ করে এবং কিভাবে উদ্ভিদ-ধ্বংসকারী পোকা ও আগাছাকে ধ্বংস করা যায় সে সম্বন্ধে অনুশীলন করা যাচ্ছে।

আইসোটোপ বা পরমাণুকণিকা সম্পর্কে গবেষণা থেকে কৃষকরা বুঝতে পেরেছে যে, কিভাবে সারকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো যায়। উদ্ভিদেব খাদ্যের মধ্যে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা মিশ্রিত করে বৈজ্ঞানিকগণ কোথায় ও কিভাবে সার প্রয়োগ করলে বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী খাদ্য হজম করতে পারে, কখন উদ্ভিদ এদের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী ব্যবহারে লাগাতে পারে, কোন্ কোন্ মাটিতে কোন্ কোন্ সার লাগে এবং কিভাবে মাটি থেকে উদ্ভিদ কর্তৃক সার সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি তথ্য জানতে পেরেছেন।

উত্তর ক্যারোলাইনা স্টেট কলেজের একটি মাত্র গবেষণায় ঐ প্রদেশের কৃষকদের বছরে প্রায় ৪৩০০ টন সুপার ফসফেট বেঁচে গিয়েছে, কেননা ঐ গবেষণায় নির্দ্ধারিত হয় যে, তামাক গাছ বাড়বার সময় ফসফেট সার ব্যবহার করতে পারে না। নিউ ইংল্যাণ্ডেও ফসফোরাস গ্রহণ জনিত পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, উদ্ভিদ মাটি থেকে যতখানি ফসফোরাস সংগ্রহ করে তার চেয়ে অনেক বেশী ফসফোরাস সার হিসেবে কৃষকরা ব্যবহার করে। অন্যান্য পরীক্ষায়

জানা গিয়েছে যে আলফালফা ও অন্যান্য কয়েকটি উদ্ভিদের শীতকালে মৃত্যুর হার শীতের সময় জমিতে ফসফোরাস ব্যবহার করে কমানো যায়।

মাটি থেকে যে সকল খনিজ পদার্থ উদ্ভিদরা গ্রহণ করে সেসব খনিজ পদার্থ যদি উদ্ভিদের টিস্থ বা কলাস্থিত কোনও অদ্রবণীয় যৌগিক পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় তা'হলে কতকগুলি উদ্ভিদ রোগের সৃষ্টি হয় বলে আপাততঃ মনে হয়। কেমন করে ও কিভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় তা নির্দ্ধারণ করার জন্য বর্ত্তমানে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা ব্যবহার করা হচ্ছে। ফল গাছের ক্লোরোসিস নামে এক বহু বিস্তৃত রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে, ক্ষারযুক্ত মাটি থেকেই সম্ভবতঃ এরূপ হয়, কেননা মাটি ক্ষারযুক্ত হওয়ায় ফলগাছ লোহা, দস্তা, তামা ও ম্যাঙ্গানিজ যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে না।

ওকগাছগুলি যে জটিল ও পরস্পর জড়ানো মূলের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যও তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা (রেডিও আইয়োডিন) ব্যবহৃত হয়েছে। মূলের মধ্য দিয়ে সন্ধানী তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কণিকার গতিপথ লক্ষ্য করে জানা গিয়েছে যে মূলের কলমের মধ্য দিয়ে এই রোগ এক গাছ থেকে আর এক গাছে সঞ্চারিত হয়। পাইন গাছের এক প্রকার রোগ সম্বন্ধেও এইভাবে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

শস্যের কীট ধ্বংস করার কাজে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকাকে বিবিধভাবে ব্যবহার করা হয়। মাছি ও অনুরূপ কীটপতঙ্গকে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার সাহায্যে চিহ্নিত করবার পর তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। বায়ুবাহিত ফাঙ্গাস বা ছত্রাক সম্পর্কেও অনুরূপভাবে অনুসন্ধান করা যায়। কীটপতঙ্গ ও আগাছা নষ্ট করার জন্য যেসব পদার্থ ব্যবহৃত হয়, তাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে এভাবে সন্ধান পাওয়া যায়। এভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, কোনও কোনও শ্রেণীর মাছি ডি ডি টিকে নিজেদের দেহের মধ্যে বিষহীন বস্তুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়

এবং এইভাবেই ডি ডি টি'র মারাত্মক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু আরও দু-একটি রাসায়নিক পদার্থ ডি ডি টি'র সঙ্গে মিশিয়ে দিলে মাছিরা আর পরিত্রাণ পায় না।

পারমাণবিক নিউক্লিয়াস থেকে যে সকল রশ্মি বিকীর্ণ হয় তাদের একটা বিশিষ্ট গুণ বা দোষ এই যে, তারা জন্তু ও উদ্ভিদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব ঘটায়। এক প্রকারের মাছি গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর মৃত্যু ঘটায় এবং ফলে বছরে বহু কোটি ডলারের ক্ষতি হয়। এদের উপদ্রব কমানোর জন্য তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকাকে এক অভিনব উপায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শ্রেণীর মাছির (স্ক্রু ওয়ার্ম) বীক্ষণাগারে প্রজনিত পুরুষগুলিকে রেডিও-কোবাল্টের গামা রশ্মি দ্বারা বন্ধ্যা করে দেওয়া হয়। এদের স্ত্রীরা জীবনে মাত্র একবার সহবাস করতে পারে, কাজেই যেখানে ঐ মাছির উৎপাত বেশী সেখানে যদি বন্ধ্যা পুরুষগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয় তা'হলে অনেকগুলি স্ত্রী মাছি তাদের সঙ্গে সহবাস ক'রে কানা ডিম প্রসব করবে। কাজেই তাদের বংশবৃদ্ধি উপশমিত হবে। আমাদের কৃষি বিভাগের কীট বিশারদ রেমণ্ড বুশল্যাণ্ড ১৯৫৩ সালে এই অভিনব উপায়ে কীটনাশের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

রেডিও আইসোটোপ জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যায় যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি শিল্পেও ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণায় তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার নানাভাবে ব্যবহার হচ্ছে। বর্ত্তমানে জৈব রসায়ন ও রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যায় মৌলিক গবেষণা থেকে শুরু করে রান্নার খাদ্যের সঙ্গে কি কি মিশ্রণ প্রয়োজন বা চালের মধ্যে কিভাবে জল যায় এ সবই অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকাকে অনেক প্রকার শিল্প প্রক্রিয়ায় কলকব্জা নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন বস্তুর সন্ধান করার কার্য্যেও ব্যবহার করা হচ্ছে। কতকগুলি বিশেষ প্রয়োগ নিম্নে বর্ণিত হ'ল :—

বেধ নিরূপণ

কাগজ, রবার, প্লাষ্টিক বা মিহি ধাতুর পাতের একদিকে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা রেখে ধীরে ধীরে পাতটিকে সরানো হয়। তেজস্ক্রিয় সন্ধানী একটি যন্ত্র অপরদিকে রেখে পাতের মধ্য দিয়ে কতখানি রশ্মি আসছে তা মেপে পাতটির ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বেধ মাপা যায় এবং কমবেশী থাকলে সংশোধনও করা যায়।

রেডিওগ্রাফি

ঢালাই, ছাঁচে ঢালাই বা জোড়া দেওয়ার কাজে যদি কোন দোষ থাকে, তা'হলে সে দোষ যেমন এক্স-রে দিয়ে ধরা যায়, তেমনি তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা থেকে নির্গত রশ্মিদ্বারাও ঐ দোষ নিরূপণ করা যায়, অথচ উহাদের এক্স-রে অপেক্ষা কম খরচায় পাওয়া যায় ও সহজে ব্যবহার করা যায়।

ছিদ্রান্বেষণ

দেওয়ালের গায়ে প্রোথিত ও জটিলভাবে স্থাপিত নলের মধ্যে যদি অল্প ছিদ্র দেখা দেয় তা'হলে নলের দ্বারা বাহিত বস্তুর মধ্যে তেজস্ক্রিয় বস্তু মিশ্রিত করে ছিদ্রগুলির সঠিক স্থান নির্দ্ধারণ করা যায়।

নলের মধ্য দিয়ে যেসব তরল পদার্থ যায় তার সন্ধান করা

কতকগুলি শিল্পে শত শত মাইল লম্বা নল থাকে এবং অনেক তরল পদার্থ তার মধ্য দিয়ে পর পর প্রবাহিত হয়। এগুলি যাতে পরস্পর মিশে না যায়, তার জন্য জানা প্রয়োজন ঠিক কখন একটি তরল পদার্থের প্রবাহ শেষ হয় এবং পরবর্ত্তী প্রবাহ আরম্ভ হয়। দু'টি পৃথক প্রবাহের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখায় সামান্য তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা দেওয়া থাকলে, ঐ সীমানা কখন্ নলের কোন্ অংশ দিয়ে যাচ্ছে, তা একটি সন্ধানী যন্ত্রে ধরা পড়ে।

নিরাপত্তা মূলক যন্ত্রসমূহ

যন্ত্রচালক মিস্ত্রীর কব্জিতে একটি তেজস্ক্রিয় পট্টি বাঁধা থাকে, আর একটি সন্ধানী যন্ত্র কলের উপর থাকে। মিস্ত্রীর হাত যদি কোন বিপজ্জনক স্থানে এসে পৌঁছায়, তা'হলে পট্টির তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়ে এমন একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় যাতে কলটি থেমে যায়।

শিল্পে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার ব্যবহারের বহু নিদর্শনের এই কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হ'ল। শ্রমশিল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণায় এটি আরও বেশী ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ব্যবহার হ'ল, একটি পৃষ্ঠ থেকে আর একটি পৃষ্ঠে যদি সামান্য সামান্য বস্তু চলে যায়, যেমন যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে হয়, সেই বস্তুগুলির পরিমাপ করা। পিষ্টনের আংটি বা গীয়ার ক্ষয়প্রাপ্ত হলে সেই ক্ষয় সঠিকভাবে মাপা যায় প্রথমে তাদের তেজস্ক্রিয় করে এবং পরে ব্যবহৃত তৈলের তেজস্ক্রিয়তা নির্দ্ধারণ করে। ক্যালিফোর্ণিয়া রিসার্চ্চ করপোরেশন ঘোষণা করেছেন যে, এই কৌশলে তারা পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার খরচ করে চার বছরে যা করেছেন, তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা না থাকলে তা করতে ছ'বছর লাগত ও দশ লক্ষ ডলার খরচ হ'ত। মোটরের টায়ারগুলির ক্ষয়ও এভাবে মাপা যায় টায়ারের বাইরের অংশে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা সংযুক্ত করে দিয়ে। একটি মুখ্য রবার কোম্পানি এরূপ করছেন।

এভাবে সন্ধান করার কৌশলটি প্রয়োগ করার সর্ব্বশেষ একটি উদাহরণ থেকে এর সুবিধা বোঝা যাবে। তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা ব্যবহারের পূর্ব্বে মেসিন টুলের ধারালো অংশের ক্ষয় নিরূপণ করার জন্য যে অনুশীলন দরকার তা এত সময় নিত যে ততক্ষণে যন্ত্রটির জীবন প্রায় শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এখন এ যন্ত্র ব্যবহারের ৬ থেকে ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে এই মাপ করা যায়।

শ্রমশিল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণায় সন্ধানী তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার ব্যবহার হচ্ছে, সাবান জাতীয় জিনিষ কিরূপ দক্ষতার সঙ্গে ময়লা দূর করতে পারে তা নির্দ্ধারণ

করা, খনিজ ধাতব পদার্থ ভাসমান করার প্রক্রিয়া বিচার করা, টেলিফোন স্তম্ভে যে সকল রক্ষাকবচ ব্যবহার করা হয়, তার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করবার সময়ে যে প্রতিক্রিয়া হয় তার অনুশীলন করা প্রভৃতি কার্যে।

এসব ব্যবহার ছাড়া নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরের সাহায্যে শিল্পে নূতন এক বিশ্লেষণমূলক কৌশলের প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। রি-অ্যাক্টরে যদি কোন বস্তু রাখা যায়, তা'হলে অতি সামান্য ভেজাল জিনিষ থাকলে তাও তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠে। খাদ্যে, ঔষুধে, ধাতুতে এবং অন্য বস্তুতে সামান্য অশুদ্ধিও তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কণিকার সাহায্যে সঠিক মাপা যায় অথচ অন্য কোনও উপায়েই তা ধরা যায় না।

এই পরিচ্ছেদের গোড়ার দিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউরেনিয়াম পরমাণুগুলি ক্ষুদ্রতর তেজস্ক্রিয় অংশে ভিন্ন হওয়ার ফলে তেজনিয় পরমাণু-কণিকার সৃষ্টি হয়। এইগুলি রি-অ্যাক্টর যন্ত্রে পরমাণুবিভাজন ক্রিয়ার উপজাত। এতদিন পর্য্যন্ত তারা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করত। চুল্লীতে ছাইয়ের মত বেশী জমে গেলে তারা রি-অ্যাক্টরের ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে এবং রি-অ্যাক্টর জাত প্লুটোনিয়ামকে সেগুলি থেকে পৃথক না করলে প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা যায় না। পরমাণু বিভাজন থেকে যে সকল বস্তু জন্মায় তার বেশীর ভাগই বর্ত্তমানে ব্যবহার করা হয় না, মাটির নীচে বিরাট ট্যাঙ্কে জমা করে রাখা হয়। অথচ এই উপজাত দ্রব্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তা থাকে, যা শিল্পে অনেক ব্যবহৃত হতে পারে।

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের নিকট থেকে এইসব উপজাত দ্রব্যের সম্ভাব্য ব্যবহার অনুশীলন করবার ঠিকা নিয়েছেন ষ্টানফোর্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। উঁহাদের ১৯৫১ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানা যায়, ঐ উপজাত বস্তু সকলের সম্ভাব্য চাহিদা যথেষ্ট আছে, কিন্তু চাহিদার সঠিক পরিমাণ নির্ভর করে কি দামে জিনিষটা পাওয়া যাবে তার উপর। পরমাণুবিভাজনের উপজাত

দ্রব্যাদি যদি খুব সস্তায় পাওয়া যায় তা'হলে শিল্পে ওগুলির ব্যবহার অনেক পরিমাণেই হবে, একথা বলা যেতে পারে।

তবে ঐ বস্তুগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে সরবরাহ করার আগে প্রায়োগিক সমস্যার (যেমন পৃথকীকরণ যন্ত্রের পরিকল্পনা) ও বিক্রয়জনিত সমস্যার (যেমন মূল্য নীতি, পেটেণ্ট নীতি ও নিরাপত্তা নীতি) সমাধান আবশ্যক। পৃথকীকরণ সমস্যাগুলি বর্ত্তমানে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং আর্থিক দিক থেকে সার্থক বিবেচিত হতে পারে এমন পর্য্যায়ে আনতে পারার আগে অনেক গবেষণার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে জ্ঞান আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানের প্রয়োজন। সুতীব্র রশ্মির উৎস কয়েকটি পরমাণু বিভাজনজাত পদার্থ বর্ত্তমানে এক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

ষ্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট রিপোর্ট দিয়েছেন যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঐ সকল উপজাত দ্রব্য যদি প্রতি 'কিউরি' (এক 'কিউরি' প্রায় বিশ হাজার ডলার মূল্যের রেডিয়ামের সমান) ১০০ ডলার মূল্যে বা তারও কম মূল্যে সরবরাহ করা যায়, তা'হলে ঐগুলিকে বেতারযন্ত্রে শব্দগ্রহণের বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী প্রতিপ্রভ আলোকের নল নির্ম্মাণ করার জন্য এবং নূতন প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করার জন্য ব্যবহার করা যায়। এর চাইতেও দাম কমিয়ে যদি প্রতি কিউরি পাঁচ ডলার করা যায়, তা'হলে তাদের রেডিওগ্রাফি শিল্পে ব্যবহার করা যায়। যদি প্রতি কিউরি দু'ডলার মূল্যে পাওয়া যায়, তা'হলে পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধগুলিকে উত্তাপ না দিয়ে বীজাণুশূণ্য করবার কাজে লাগানো যায়। আর দাম যদি প্রতি কিউরি এক ডলারের নীচে আনা যায়, তা'হলে তাদের নানাজাতীয় খাদ্যকে বীজাণুশূণ্য করবার কাজে লাগানো যায়।

আমরা বর্ত্তমানে যতটুকু জানি তাতে মনে হয় যে, শেষোক্ত ব্যবহার সন্দেহ-

জনক। খাদ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বীজাণু ও জীবাণু নষ্ট করতে হলে খুব বেশী পরিমাণ রশ্মির দরকার। অথচ তত পরিমাণ রশ্মি প্রয়োগ করা হলে খাদ্যের স্বাদ বদলে যেতে পারে এবং বিষাক্ত জিনিষের সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই একাজের চেয়ে ঔষুধকে বীজাণুশূন্য করার কাজে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার ব্যবহারের সম্ভাবনাই বেশী।

যে সকল উপায়ে বর্ত্তমানে জীববিদ্যায়, চিকিৎসাবিদ্যায়, কৃষিবিদ্যায়, রসায়নে ও বিভিন্ন শিল্পে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার ব্যবহার হচ্ছে এই পরিচ্ছেদে তার কতকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ভবিষ্যতে আরও কত ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যাবে, তা বর্ত্তমানে কেউই বলতে পারে না। তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কণিকার ভবিষ্যৎ ব্যবহার, বিশেষ করে গবেষণায়, নির্ভর করে যে মানুষ ব্যবহার করবে তার প্রয়োগিক বুদ্ধির উপর। তবে একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে মানুষ যতদিন জীবন-প্রক্রিয়া ও বহির্জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির চেষ্টা করবে ততদিন তারা শক্তিশালী ও বিচিত্র যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আগামী দিনের পথ

মানবজাতির পারমাণবিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। আপনারা হয়ত পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংসপ্রায় পৃথিবীর উপর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উপন্যাস পড়েছেন। কোনও শহরের সিটি হলে যদি হাইড্রোজেন বোমা ফাটে, তা'হলে সেই শহরবাসীর কি হবে সে সম্বন্ধে ছবি দেখেছেন অথবা অ্যাসপিরিণের বটিকার মত ক্ষুদ্র একটি ইউরেনিয়াম বটিকার সাহায্যে মহাসমুদ্রগামী জাহাজ কতবার পৃথিবী পরিক্রমা করতে পারে, কিভাবে মোটরগাড়ী যতদিন টি'কবে ততদিন তাকে চালানো যায় বা চন্দ্রে রকেট-জাহাজ পাঠানো যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে গল্প পড়েছেন। পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে কবে ক্যানসার নিরাময় হবে, খাদ্য প্রচুর হবে, বিনা-খরচায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হবে এবং বহুপ্রকারের নূতন উদ্ভিদ ও জন্তু সৃষ্টি হবে, সেইসব সম্বন্ধে আন্দাজ করে বলা অনেক গল্প শুনেছেন।

এ সকল জল্পনা-কল্পনার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর কতকগুলি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, অবৈজ্ঞানিক ও রোমাঞ্চকর মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট। আমরা সবাই জানি, পারমাণবিক যুগের প্রথম দশকে কি উৎপন্ন হয়েছে। বিরাট ধ্বংস-শক্তি সম্পন্ন অস্ত্র উদ্ভাবিত, পরীক্ষিত ও আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে জমা হয়েছে। ব্যবহারোপ-যোগী পারমাণবিক বৈদ্যুতিক শক্তি পরীক্ষার উপযোগী পরিমাণে উৎপন্ন হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। আগামী বৎসরে (১৯৫৪) উহা সমাপ্ত হবে। পারমাণবিক যুগের বিস্ফোরক ও

ইন্ধন বিপুল পরিমাণে তৈরী করার জন্য বহু শত কোটি ডলার খরচায় এক বিরাট শিল্পের পত্তন করা হয়েছে। কতকগুলি রোগ বিশেষ করে থাইরয়েড অর্থাৎ কণ্ঠগ্রন্থির অতিক্রিয়াজনিত রোগ তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা দ্বারা হয় আরোগ্য করা যায়, নয় ব্যাহত করা যায়। তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহার করে জমিতে সার প্রয়োগ, রেডিয়োগ্রাফি এবং বেধ মাপা প্রভৃতি কৃষি ও শিল্পঘটিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

আপাততঃ নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রগতি ঘটেছে অস্ত্রশস্ত্রের নক্সা রচনায় ও নির্ম্মাণে, কিন্তু সাধারণ প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তাও বেশ উৎসাহজনক। বিদ্যুৎশক্তি বা মোটর-ইঞ্জিন আবিষ্কারের দশ বছরের মধ্যে যতটুকু উন্নতি হয়েছিল তার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় পারমাণবিক শক্তির কত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।

কিন্তু ততঃ কিম্? পারমাণবিকযুগে মানবসমাজের ভবিষ্যৎ কি? হয়ত সর্ব্বাপেক্ষা ভালো উত্তর হচ্ছে, 'কে জানে?' দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করবার যোগ্য, তাঁরা গত দশ বছর যাবৎ অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন। যে সকল অতিকায় প্রতিষ্ঠানে স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ উৎপন্ন করা হয়, সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মীদের নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির নক্সা প্রস্তুত করা ও সেগুলি গড়ে তোলার কাজে তাঁরা ব্যস্ত রয়েছেন। অথবা অস্ত্রের উদ্ভাবন, পরীক্ষা ও উৎপাদনে, অথবা পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি যাতে সঙ্গে সঙ্গে বিরাট নির্ম্মাণমূলক কাজে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য প্রায়োগিক গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন।

গত দশ বছরকে বলা যায় একটা অনিশ্চয়তার যুগ, যখন কেবল উদ্ভাবন হয়েছে, আর অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখা গিয়েছে। খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ করা, স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ উৎপন্ন করা এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করার যে পরিকল্পনা ছিল, এই যুগটাতে শুধু সেই পরিকল্পনার পক্ষে ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে এমন সব সম্ভাবনাপূর্ণ কাজের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। আর সম্ভবতঃ, তা

দেওয়া হয়েছে খুবই সঙ্কীর্ণভাবে।

এভাবে নজর দেওয়ার জন্য আমার যে দায়িত্ব আছে, তার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। অপরপক্ষে আমি এর জন্য গৌরবই বোধ করি, কেননা আমার মতে এর সাহায্যে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ নিবারণ করার কাজে অনেক সাহায্য হয়েছে। তবে দূরপ্রসারী পরিকল্পনার দিক দিয়ে দেখলে বলতে হয়, কিছু কিছু বাঞ্ছনীয় কাজ এযুগে সম্পন্ন হয়নি, যা হওয়া উচিত ছিল। জরুরী ও দ্রুত প্রসারণের ঐ যুগ এখন প্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রসারণের বৃহত্তর কার্যসূচী এখন প্রায় আরম্ভ হয়েছে। এখন থেকে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে পরিকল্পনা করা যায় এবং করা উচিত। এমন কি কর্ম্মব্যস্ত অতীত থেকে এমন কতকগুলি আভাস পাওয়া গিয়েছে যার সূত্র ধরে নিরলসভাবে চললে আগামী দশ বছরের মধ্যে আমাদের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এ সকল সূত্র ধরে যে চেষ্টা চলবে তা যে আমাদের ঠিক কোথায় নিয়ে যাবে বলা কঠিন। কেননা, আমাদের প্রগতির দিক ও বেগ দুইই জ্ঞেয় পরমাণুর উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে অজ্ঞেয় মানুষের উপর। কাজেই আগামী দশ বছরে পারমাণবিক বিকাশ কোন্ পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছুবে তা আগে থেকে বলা অসম্ভব। যদি আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করি তা'হলে কতদূর পৌঁছানো সম্ভব শুধু সেটুকুই এখন বলা যেতে পারে। যেমন আগামী দশ বছরের শেষা-শেষি এমন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব যা কয়লা বা তেল থেকে উৎপন্ন শক্তির সাহায্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে। এরূপ খুবই সম্ভব যে, ১৯৬৩ সাল নাগাৎ যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদক কারখানা স্থাপিত হবে, তার শতকরা দশটি বা তার চেয়েও বেশী কারখানা পারমাণবিক ইন্ধন দ্বারা চালিত হবে। বেলজিয়ামের মত যে সকল জায়গায় কয়লা মহার্ঘ্য, সে সকল স্থানে পারমাণবিক কারখানার

সংখ্যা আরও বেশী হওয়ারই সম্ভাবনা এবং শেষকালে যে আরও বেশী হবেই তাতে সন্দেহ নেই।

দশ বছরের মধ্যে আমরা এমন সব রি-অ্যাক্টর চালু করতে পারব যাতে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থেকে যুগপৎ নিউক্লিয়ার ইন্ধন এবং শক্তি উৎপাদন করবে। এছাড়া আগামী দশ বছরের মধ্যে শুধু সাবমেরিনই যে পারমাণবিক যন্ত্র দ্বারা চালিত হবে তা নয়, মার্কিন নৌবহরের বড় বড় বিমানবাহক জাহাজও এই যন্ত্রদ্বারা চালিত হবে। এও সম্ভব, যদিও খুব বেশী নয়, এমন একটি পারমাণবিক চালক যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে পারে, যার দ্বারা ব্যবসায়ী জাহাজও চলতে পারে। এই সবই দশ বছরে হয়ত নাও হতে পারে, হয়ত পনেরো বছর সময় লাগতে পারে, অবশ্য যদি আমরা তা চাই। আগামী দশ বছরের মধ্যে আর একটি সম্ভাব্য পরিণতি হচ্ছে বিমানবাহিনীর জন্য পারমাণবিক শক্তি চালিত বিমানপোত। এই পরিণতি একমাত্র নির্ভর করে, সরকার বছরে কত টাকা এর উদ্ভাবনের জন্য খরচ করতে প্রস্তুত আছেন তার উপর। তবে যত টাকাই খরচ হোক, আগামী দশ বছরের মধ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোনও পারমাণবিক শক্তি চালিত বিমান চলবে কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে, যদিও ইহা পরে নিশ্চয়ই এক সময়ে বাস্তবে পরিণত হবে।

অধুনা প্রায় বিস্মৃত, বায়ু অপেক্ষা হাল্কা বেলুনজাতায় বিমানপোতে পারমাণবিক এঞ্জিন ব্যবহার করা সহজ। এই জাতায় বিমানপোত পারমাণবিক এঞ্জিনের চারপাশে যে ভারী রক্ষাপ্রাচীর দেওয়া প্রয়োজন, তাকে এরোপ্লেন অপেক্ষা সহজেই বহন করতে পারে। পারমাণবিক ইন্ধন ব্যবহার করা হলে তৈল ব্যবহার জনিত অগ্নিকাণ্ডের ভয় থাকে না। তবে ১৯৬৩ সালের আগে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এরূপ পারমাণবিক শক্তি চালিত বেলুন যদি চালু করতে পারেন, তা'হলে আমি বিস্মিতই হ'ব। আমার অবশ্য এ রকম বিশ্বাস আছে যে, কেউ যদি খরচা বহন করতে রাজী থাকে, তা'হলে এ ধরণের পরীক্ষার

উপযোগী যন্ত্র দশ বছরের মধ্যেই প্রস্তুত হতে পারবে। পনেরো-কুড়ি বছরের মধ্যে ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য এই ধরণের বিমানপোত চালু না হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না।

আমার বিশ্বাস আগামী দশ বছরের মধ্যে পরমাণু চালিত রেলওয়ে ইঞ্জিন হওয়া সম্ভব। তবে কেউ এত শীঘ্র এর জন্য চেষ্টা করলে আমি বিস্মিতই হ'ব। পারমাণবিক ইঞ্জিনের যে সকল বিশেষ বিপদ আছে এবং উহা উদ্ভাবন করা যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষ তাতে মনে হয় পারমাণবিক শক্তির অন্য ব্যবহারই আগে উদ্ভাবিত হবে।

পারমাণবিক শক্তি চালিত মোটর গাড়ীর কথা খুব বেশী আলোচিত হয়েছে, তবে আমার মনে হয় এ প্রশ্ন আগামী দশ বছরে উঠবে না, হয়ত কখনই উঠবে না। পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া থেকে যে সকল মারাত্মক তেজ নিষ্ক্রান্ত হয় তা থেকে গাড়ীর চালক ও আরোহীকে রক্ষা করার জন্য যে প্রকার বৃহদাকার ও ভারী বর্মের দরকার, তা এত ছোট গাড়ীতে ব্যবহার করা অসম্ভব। আবার, পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার জন্য নিউক্লিয়ার ইন্ধনের একটা বিশেষ পরিমাণ দরকার। ইন্ধনের পরিমাণ তার কম হলে প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। মোটর গাড়ী চালাতে গেলে যে পরিমাণ শক্তি লাগে, অনেক বেশী শক্তি ঐ ন্যূনতম নির্দ্দিষ্ট নিউক্লিয়ার ইন্ধন থেকে উৎপন্ন হবে। কাজেই মোটর গাড়ীতে ব্যবহার করলে শক্তির এতখানি মূল্যবান উৎসের অত্যন্ত অপব্যয় হবে। তবে এমন সম্ভাবনা আছে যে, পারমাণবিক বিভাজন থেকে যে সকল অব্যবহার্য্য বস্তু পাওয়া যায়, যাকে সাধারণ দহন থেকে উৎপন্ন ভস্মের সঙ্গে তুলনা করেছি—তার তীব্র তেজস্ক্রিয়তা অবশিষ্ট থাকে। এই তেজস্ক্রিয়তাকে ব্যবহার্য্য শক্তিতে পরিণত করবার উপায় কেউ হয়ত উদ্ভাবন করতে পারেন। এই প্রকারের চেষ্টা যদি সফল হয় ত উপরি উল্লিখিত পারমাণবিক 'ভস্মের' সামান্য কিছু নিয়ে তার উত্তাপে মোটর গাড়ীর মত ছোট গাড়ী চালানো যায়।

তবে আগামী দশ বছরের মধ্যে এর কোনও সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হয় না।

এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে যাওয়ার জন্য মহাশূন্যে ভ্রমণকারী পোতে পারমাণবিক ইন্ধনের প্রস্তাবিত ব্যবহার নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলেছে। এই ব্যাপারে কিন্তু একটি প্রধান অসুবিধা আছে। পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর ব্যবহারকারী বিমানপোত বা নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র জেট চালিত বিমানের মত সম্মুখভাগ দিয়ে বায়ু ভেতরে টেনে নিয়ে তা উত্তপ্ত ও বর্দ্ধিত করে পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়ে উদ্গীরণ করতে পারে এবং এভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে চলতে পারে। কিন্তু মহাশূন্যে বায়ুমণ্ডল নেই। কাজেই মহাশূন্যে ভ্রমণকারী পারমাণবিক পোতকে এমন কোন বস্তু বয়ে নিয়ে যেতে হবে যাকে গরম করে পিছন দিক দিয়ে উদ্গীরণ করে সে নিজেকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিতে পারে। সুতরাং যাঁরা মহাশূন্যে ব্যবহার্য যানের নক্সা প্রস্তুত করছেন তাঁদের সম্মুখে ঐ যানের আকার ও ভারের যে সমস্যা রয়েছে সে সমস্যা পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করলে আপনা-আপনি মীমাংসা হয়ে যাবে না।

মোটামুটি বলতে গেলে, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, জাহাজ এবং সম্ভবতঃ বড় আকারের বিমানপোত প্রভৃতি যেসব ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদনের উৎসের পরিমাণ বিপুল হওয়া দরকার সেইসব ক্ষেত্রেই ক্রমশঃ পারমাণবিক শক্তি ব্যবহৃত হবে বলে মনে করি। যেখানে শক্তির উৎসের পরিমাণ অল্প হওয়া দরকার, যেমন বাড়ী গরম করবার চুল্লী, ছোট বিমানপোত কিংবা মোটর গাড়ীতে এই শক্তির ব্যবহার, অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে, সম্ভাব্য বলে আমার বিশ্বাস হয় না। তবে অধিক শক্তি উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহৃত হতে থাকলে, অন্যান্য স্থানে তৈল কয়লা ও গ্যাস ব্যাপকতরভাবে ব্যবহৃত হবার আর বাধা থাকবে না।

শক্তি ব্যবহার ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আমি আশা করি যে, রেডিও-আইসোটোপ

জাতীয় নিউক্লিয়ার রশ্মির উৎসসমূহ আরও ব্যাপকভাবে চিকিৎসায়, শিল্পে ও কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হবে। এর প্রয়োগ সম্পর্কে আরও অনেক লোক শিক্ষিত হবে এবং আরও অনেক লোকের জীবনযাত্রার উপর এদের প্রভাব পড়বে। তবে এক্ষেত্রে আগামী দশ বছরের মধ্যে কোনও চমকপ্রদ আবিষ্কারের সম্ভাবনা একেবারেই যে নেই তা নয়। তবে সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা যে ক্ষেত্রে আছে তা হচ্ছে, ক্যানসার রোগ সংক্রান্ত গবেষণা। এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতির সম্ভাবনা (তবে সকলপ্রকার ক্যানসার রোগের একমাত্র ঔষধ উদ্ভাবিত না হওয়াই সম্ভব) : তাছাড়া সালোক-সংশ্লেষ অনুশীলনে এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, উদ্ভিদ কি করে বাড়ে তা মানুষ আবিষ্কার করবে এবং তীব্র তেজস্ক্রিয় বস্তুকে নূতন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ সৃষ্টির জন্য এবং ঔষধ ও কয়েকস্থলে খাদ্যকে বীজাণুশূন্য করবার কাজে ব্যবহার করবে।

তবে, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'এসব থেকে আমার ব্যক্তিগত সুবিধা কি হবে ?' আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পোন্নত পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী হন, তাহলে হয়ত দশ বছরের মধ্যে আপনারা বাড়ীতে পারমাণবিক শক্তিজাত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন। আমি আগেই লিখেছি যে এতে আপনার বিদ্যুৎ-খরচের বিল বিশেষ কিছু কম-বেশী হবে না, তবে আপনার শহরটি হয়ত একটু বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, বাস করার বেশী উপযুক্ত হবে, কেননা বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র থেকে ধোঁয়া বার হবে না। তবে আপনার বাড়ীর একতলার ঘরে স্থাপিত একটি ছোট রি-অ্যাক্টরের সাহায্যে আপনার বাড়ীতে বিদ্যুৎ ও উত্তাপ সরবরাহ করার সম্ভাবনা আগামী দশ বছরে কিছুই নেই এবং চিরকালের জন্য না হলেও পরবর্তী বহু দশকের মধ্যেও তা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

আপনি যদি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রদেশে বাস করেন, যেমন রকি পাহাড় অঞ্চলে, তা'হলে পারমাণবিক ক্ষমতা দ্বারা আপনার জীবনযাত্রা পরিবর্তিত

হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। পূর্ব্বে যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ একেবারেই ছিল না, অথবা খুব কম ছিল, সেখানে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এমনও হতে পারে যে, কতকগুলি খনিজদ্রব্য যা প্রয়োজনীয় শক্তির অভাবে মৃত্তিকা গর্ভেই থেকে গিয়েছে, তা মানুষের কাজে লাগবে, হয়ত কিছু অনুর্ব্বর জমিতে পাম্প করে সেচের জল দেওয়া যাচ্ছে না শক্তির অভাবে, সে সব জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হবে। এমনও হতে পারে যে, ব্যবহার্য্য শক্তির প্রাচুর্য্যের জন্য কয়েকটি শিল্প:আপনাদের অঞ্চলে চলে যাবে—কাঁচা মাল কাছাকাছি থাকার জন্য। তবে মাত্র দশ বছরের মধ্যে ঐসকল পরিবর্ত্তনের শুধু আরম্ভ ছাড়া আর কিছু হবে কি না সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

তবে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আগামী দশ বছরের মধ্যে আপনার বা আপনার জানিত কোন লোকের জীবন তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার সাহায্যে বেঁচে যাবে;বা আরও সুখাবহ হবে, এরূপ সম্ভাবনা খুব বেশী। এরূপ সম্ভাবনাও খুব বেশী যে, আপনি হয়ত এমন কোন শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য কিনবেন, যেমন টায়ার, ইঞ্জিনের তৈল বা সাবান জাতীয় বস্তু যা তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকাযোগে উন্নত হয়েছে। আপনি যদি চাষবাস করেন, তাহ'লে খুবই সম্ভব যে, আপনার জেলায় কাউন্টি-এজেন্ট স্থানীয় কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্র দ্বারা সরবরাহ করা কোন জ্ঞান হাতেকলমে ব্যবহার করবেন, যা তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকার ব্যবহার থেকে লাভ করা গিয়েছে। যতই সময় যাবে, ততই এই মূল্যবান্ বস্তুগুলি আপনার জীবনকে নানাদিক থেকে প্রভাবান্বিত করবে।

এগুলি কিন্তু আমরা যা জানি বা আমরা এখন যা থেকে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি এমন জিনিষের কথাই বলা হ'ল। আমি বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় যে, পারমাণবিক শক্তি কার্য্যসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন পরমাণু হতে এর চেয়ে বেশীই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি তা নাও যায় তা' হলেও এমন একটা যুগ কল্পনা করা সম্ভব যে যুগে

আরও নূতন কাজ পাওয়ার সুযোগ এবং অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পাওয়া যাবে, পৃথিবীর নূতন অঞ্চল উন্নত ও লোকবাসের যোগ্য হবে, নূতন নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হয়ে বাজারে আসবে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে জীবন রক্ষার নূতন নূতন কৌশল আয়ত্ত ও ব্যবহৃত হবে। পারমাণবিক যুগ আশাপ্রদ, সমৃদ্ধ ও সুখপূর্ণ হতে পারে। অথবা আবার এও সম্ভব হতে পারে যে, এই যুগে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত নিজের বিনাশ সাধনে সফল হবে।

পরমাণুর অন্য দিক—অর্থাৎ অস্ত্রের দিক অত্যন্ত বাস্তব। ও-দিকটা নেই বা মানব সভ্যতার পক্ষে ওটি বিপজ্জনক নয়, এমন ভাব দেখানোর কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। একটি সহজ সত্য হচ্ছে এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের যে ভাণ্ডার জমে উঠেছে তার পরিমাণ বর্ত্তমানে এমন যে মানুষ শীঘ্রই পৃথিবীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবে। পার-মাণবিক যুগের মূল সমস্যা এই সর্ব্বনাশকে নিবারণ করা। এটি কিন্তু বৈজ্ঞানিক বা প্রায়োগিক সমস্যা নয়, এটা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা এবং এ সমস্যার সমাধান হতে পারে একমাত্র কূটনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির দ্বারা।

ইতিহাসে চিরকালই দেখা যায় যে, যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ভয় মানুষের জীবনের সাথী। যদিও অনেকে চেষ্টা করেছেন, তবু কেউই যুদ্ধের সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। কিন্তু পারমাণবিক যুগে একটি নূতন জিনিষের আবির্ভাব ঘটেছে ; এই জিনিষটির কথা বর্ত্তমান যুগে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। পূর্ব্বে সমস্যা ছিল যুদ্ধ কিংবা শান্তির, কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যা হ'ল, বিস্মৃতি অথবা শান্তি। এই দুয়ের মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে শান্তি ছাড়া অন্য উত্তর কল্পনায় আনা যায় না। অথচ মানুষ পারমাণবিক যুগেও শান্তিকেই একমাত্র পথরূপে নির্ব্বাচন করে উঠতে পারেনি। আবার বিস্মৃতিকেও গ্রহণ করেনি। সে মনে করছে, কোন একটিকে গ্রহণ না করেও সে চিরকাল চালিয়ে যেতে পারবে। অবশ্য কোনও একটিকে গ্রহণ করলেও হয়ত চলতে পারে, কিন্তু

এরূপ পন্থায় বিপদ অত্যন্ত বেশী।

এরূপ পরিস্থিতিতে একটি বাঞ্ছনীয় এবং হয়ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা স্বতঃই মনে আসে। ব্যবস্থাটি হচ্ছে, একটি তীব্র শিক্ষামূলক আন্দোলন চালানো যাতে এই দেশের এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের তো বটেই গোটা পৃথিবীর লোককেই জানানো যায়, পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্র দ্বারা বাস্তবিকপক্ষে কি কি সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারে কি পরিমাণ অস্ত্র জমা হয়েছে বা তার ধ্বংস-ক্ষমতা কতখানি, তৎসম্পর্কে জনসাধারণকে কিছু ধারণা করতে দেওয়া উচিত। পারমাণবিক যুগে বিশ্বযুদ্ধের কথা আলোচনা করে মানুষ শুধু আগুন নিয়েই খেলা করছে না, সে পৃথিবী থেকে প্রাণিজগতের সামূহিক উচ্ছেদ সাধনের অস্ত্র নিয়েই খেলা করছে।

এই ধরণের সত্যকার শিক্ষামূলক আন্দোলন চালাবার দায়িত্ব পারমাণবিক শক্তি কমিশনের মত কোনও একটি বিশেষ সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একাকী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এরূপ কর্ম্মসূচী সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে এবং তার আগে সরকারের শাসন-পরিচালন বিভাগ ও কংগ্রেসকে একমত হতে হবে যে এই প্রকারের আন্দোলন প্রয়োজনীয় ও শুভফলপ্রদ। এই আন্দোলন যদি আরম্ভ করা যায় তবে কুটনীতিকগণ সমেত পৃথিবীর সমস্ত লোককেই অন্ততঃ সঠিক ধারণা দেওয়া যাবে, সম্মুখে গ্রহণীয় পন্থা কি কি আছে। আংশিক অজ্ঞতার জন্য তারা যদি ঠিক পথ বেছে নিতে না পারে, তা'হলে পৃথিবীর পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের বিপুল ধ্বংসশক্তির সঠিক পরিচয় পেলে হয়ত ঠিক পথটি বেছে নিতে তারা উৎসাহিত হবে।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি ক্রমাগতভাবে যে কালক্ষেপ করছে তা একেবারে মারাত্মক নাও হতে পারে। স্থায়ী ও নিরাপদ শান্তি সাধিত না হলেও, পৃথিবীর পক্ষে অস্বস্তিকর যুদ্ধ বিরতির মধ্যে বাস করা সম্ভব। এরূপ অবস্থায় বিপদাশঙ্কা স্বভাবতঃই খুব বেশী। যদি সত্য এবং নিরাপদ শান্তি

প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা'হলে আমাদের শক্তিসঞ্চয় করা ছাড়া উপায় নেই, কারণ, তাতে অন্তঃত সম্ভাব্য আক্রমণকারী এজন্য নিরস্ত থাকবে যে, সে আক্রমণের অনিবার্য্য উদ্যোগ করবার আগেই প্রতি আক্রমণে পৃথিবী থেকে লোপ পাবে। এখানেও পরমাণুর স্থান খুব গুরুতর। পারমাণবিক যুদ্ধে যদি বিশ্বযুদ্ধ সম্মতিদ্বারা বন্ধ করা না যায় ত ইহা প্রতি-আক্রমণের ভয়ে নিবারিত হবে। গত আট বছরে এরকমই ঘটে আসছে এবং এ অবস্থা অনির্দ্দিষ্টকাল পর্যান্ত চলতে পারে। যদিও এটা মোটেই নিরাপদ বা নির্ভরযোগ্য নয়, তবু আমার মতে একতরফা নিরস্ত্রীকরণদ্বারা সোভিয়েট আক্রমণ ডেকে আনা অথবা স্বাধীনতা, মর্য্যাদা ইত্যাদি আমাদের যাকিছু প্রিয় তা সমস্তই রুশ কমিউনিজমের কাছে সমর্পণ করা অপেক্ষা অনেক ভালো।

আমাদের এখনকার জাতীয় নীতি হচ্ছে আক্রমণকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা, ইতিমধ্যে আমরা সত্যকার শান্তির পথ খুঁজতে থাকব এবং মুক্ত পৃথিবীতে আমাদের যে সকল বন্ধু ও সাথী আছেন তাঁদের অর্থনৈতিক ও আত্মরক্ষার শক্তি গড়ে তুলব। এই সকল লক্ষ্যের পক্ষেই পরমাণু একান্ত আবশ্যক। আমাদের ও আমাদের মিত্রদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার এটাই হ'ল প্রধান রক্ষাকবচ ; আমাদের আশা, এর ভয়েই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র নিরাপদ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত হবে এবং এর দ্বারাই মুক্ত পৃথিবীর আর্থনীতিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে আমরা সাহায্য করতে পারব।

মুক্ত পৃথিবীর আর্থনীতিক স্বাস্থ্য ভবিষ্যতে উন্নত করার পক্ষে পারমাণবিক শক্তির মূল্যকে গৌণ স্থান দিলে চলবে না। বর্ত্তমানে পূর্ব ও পশ্চিমে যে অস্বস্তিকর যুদ্ধ-বিরতির অবস্থা চালু আছে তা যদি অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত থাকে, তা'হলে তার কারণ হয়ত এই যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে করে যে, পাশ্চত্য জাতিসমূহের শিল্পপ্রধান অর্থনীতি অতি-উৎপাদন, বেকারী ও আর্থিক মন্দার চাপে শেষপর্য্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা যে তাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী

সফল হতে দিতে পারি না ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং ঐ অবাঞ্ছনীয় পরিণতি হতে পারমাণবিক শক্তি আমাদের রক্ষা করতে পারে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাফল্যের মূল গুহ্য কথা হ'ল, এর নিজের মধ্যেই এমন উপায় আছে যাতে এর অর্থনীতি নব যৌবন প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে ও প্রতি-যোগিতাকে উৎসাহিত করে, পাশ্চত্য জগৎ একের পর এক নূতন শিল্প সৃষ্টি করে চলেছে, যাতে এর অর্থনীতি গতিহীন হয়ে পড়ার অবস্থা থেকে বেঁচে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ মোটর গাড়ী শিল্প, বিমানপোত শিল্প এবং সাম্প্রতিক ইলেক্‌ট্রনিক ও সংশ্লিষ্ট সূতা শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়।

এখন পারমাণবিক শক্তির শিল্পের কাল। পারমাণবিক শক্তি মুক্ত জগতের অর্থনীতিকে অন্ততঃ তিনটি উপায়ে সাহায্য করতে পারে। ইহা নূতন অল্প-মূল্যের শক্তির উৎস হিসেবে ইউরোপের বহু অংশের এবং অন্য স্থানের শিল্পোৎপাদনের খরচ কমিয়ে দিতে পারে; ইহা পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলের উন্নতি সাধন করে ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্পোৎপন্ন বস্তুরাজির নূতন গ্রাহক সৃষ্টি করতে পারে এবং উন্নয়ন ব্যবস্থার মধ্যেই শিল্পবিষয়ক সরঞ্জাম ও বস্তুগুলির চাহিদা বাড়িয়ে পাশ্চাত্যের শিল্পপ্রধান অর্থনীতির মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। কাজেই দেখা গেল যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কারণেই আমাদের উচিত পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারগুলির প্রসারণ করবার জন্য উৎসাহের সঙ্গে চেষ্টা করা।

তবে আমাদের যদি তাই লক্ষ্য হয়, তা'হলে আপাতঃ ভবিষ্যতের জন্য আমাদের শক্তিশালী ও সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী গঠন করতে হবে। আমার নিজের প্রস্তাবিত কর্ম্মসূচীর মূল উপাদানগুলি নিম্নরূপ :—

(১) পৃথিবীতে সত্যকার স্থায়ী শান্তি আনয়নের জন্য নিরলস চেষ্টা।

(২) স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে বিরাট নির্ম্মাণ কর্ম্মসূচী এখন গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কালক্ষেপ না করা বা মন্থরগতি না হওয়া এবং

সর্ব্বোপরি এই কর্ম্মসূচীর কোনরূপ হ্রাস না করা। এখন যে সকল নির্ম্মাণ কার্য্য চলেছে, তাই যেন স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ উৎপাদনের জন্য কলকারখানা নির্ম্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারের শেষ কথা হয়। এই নির্ম্মাণকার্য্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব এগুলিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। আর একাজ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আক্রমণকারীর যুদ্ধ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার মত যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হয়।

(৩) পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে সমস্ত পৃথিবীর পুরোভাবে থাকার জন্য মৌলিক ও ব্যবহারিক গবেষণা কর্ম্মসূচীকে উৎসাহের সঙ্গে অনুসরণ করা।

(৪) পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আইনকে এমন নমনীয় করা যাতে পারমাণবিক শক্তি কমিশন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন ব্যয় আর্থিক সঙ্গতির সীমার মধ্যে রেখে স্বতন্ত্র বা যৌথভাবে ঐ শক্তি উৎপাদন করতে পারে।

(৫) আইনটি এতদূর পরিবর্ত্তনযোগ্য হওয়া প্রয়োজন যাতে যুক্তরাষ্ট্রকে যে সকল দেশ কাঁচা খনিজ পদার্থ সরবরাহ করবে তাদের সঙ্গে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত সংবাদ বিনিময় করবার ক্ষমতা কমিশনের থাকতে পারে এবং এমন কি যে সব দেশ উপযুক্ত সময়ে ভবিষ্যতে আবশ্যক খনিজ দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে বলে মনে হয় বা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের মধ্যে যারা ক্ষমতা সম্বন্ধে বা পারমাণবিক শক্তির অন্যান্য ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎসুক তাদের সঙ্গেও সংবাদ বিনিময় করবার ক্ষমতা থাকতে পারে।

(৬) পারমাণবিক শক্তি ও তার ফলাফল সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ও ব্যাপক প্রচারকার্য্য চালানো যাতে সকল শ্রেণীর লোকই এতৎ সম্বন্ধীয় তথ্য বুঝতে পারে। সরকার আংশিকভাবে এ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতাও একাজে নিতান্ত প্রয়োজন।

(৭) আমাদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বাধানিষেধ আছে, সেগুলিকে অনবরত পরীক্ষা করে দেখা যে কোন্‌গুলি প্রত্যাহার করা যায়। কারণ এরকম না করা হলে জনসাধারণকে সেই সমস্ত খবরাখবর দেওয়া সম্ভব হবে না, যাতে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে সহায়তা হতে পারে, অসামরিক আত্মরক্ষার পরিকল্পনা প্রসারিত হতে পারে, স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা হতে পারে এবং আমাদের জাতীয় আত্মরক্ষা পরিকল্পনাগুলি ব্যাহত না করে আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপন্ন পারমাণবিক শক্তি লাভ করা যেতে পারে।

(৮) ১৯৪৬ সালের পারমাণবিক শক্তি আইনের অভিপ্রায় অনুযায়ী পারমাণবিক কর্ম্মসূচী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং এতৎ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব অসামরিক নাগরিকদের হস্তে ন্যস্ত থাকবে, তবে সামরিক কর্তৃপক্ষ ও পারমাণবিক শক্তি কমিশনের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে।

পারমাণবিক শক্তি কমিশন পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসূচীর অগ্রগতি সাধনকল্পে অনেক কাজ করতে পারেন। যেমন তারা পারমাণবিক শক্তি কর্ম্মসূচীর বৈজ্ঞানিক, প্রায়োগিক, শিল্পসম্বন্ধীয় ও শিক্ষাবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে খুব গাঢ় সংযোগ রক্ষা করতে পারেন। কংগ্রেস এবং সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধকে সহজ ও প্রীতিপ্রদ করে রাখতে পারেন যাতে আসল কাজ বিবাদ-বিসংবাদের ফলে ব্যাহত না হয়। ইহারা কাজ সম্পূর্ণ নিরলসভাবে চালিয়ে যেতে পারেন যাতে আত্মরক্ষা কর্ম্মসূচীর পক্ষে অত্যাবশ্যক সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও স্বয়ং-বিভাজনশীল বস্তু দ্রুত তৈরী হতে পারে। এটা তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রণালী অনুসরণ করে এবং জনসাধারণের অর্থব্যয় করতে হলে যে সততা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন তা অবলম্বন করে অল্প খরচে এবং দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন। এঁরা এঁদের বক্তব্য ও কর্ম্মসূচী লোককে জানাতে পারেন এবং সাধারণের বোধগম্য করার ব্যবস্থা করতে পারেন। এঁরা

নেতৃত্ব ও উদাহরণ দ্বারা মৌলিক গবেষণাকে সমর্থন করতে পারেন, শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে পারেন এবং কর্ম্মসূচীতে শুধু কার্য্যকুশলতা নয়, দূরদৃষ্টির পরিচয়ও দিতে পারেন।

কিন্তু কমিশন এগুলি পারবেন না। বিশেষ করে বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে সরাসরি কোনও দায়িত্ব নেই, যদিও বিষয়টি খুবই গুরুতর। ইহা সম্পূর্ণভাবে কূটনীতিজ্ঞ, রাষ্ট্রনেতা এবং যাঁরা সরকারী নীতি নির্দ্ধারণ করেন, তাঁদের কাজ। শুধু তাই নয়, আপনারা পাঠকরা যতখানি মনে করেন, এটার সম্পর্কে আপনাদের দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী। আপনারা যা ভাবেন ও বলেন তার দ্বারাই রাষ্ট্রনৈতিক ও কূটনীতিকদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয়। চরম বিশ্লেষণে দেখা যায়, আপনারাই প্রকৃতপক্ষে সরকারী নীতি নির্দ্ধারণ করেন।

আপনারা কি মনে করেন আপনাদের সরকার পারমাণবিক যুগে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা করা প্রয়োজন তা সমস্তই করছেন? আপনারা কি মনে করেন যে, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয় তা তা'হলে আমাদের কত প্রকারের এবং কতকগুলি বোমা আছে এবং সেই বোমা কি করতে পারে তা সমস্তই আমাদের প্রকাশ করা উচিত? আপনাদের কি মনে হয় যে, পারমাণবিক ক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্যগুলি থেকে প্রগতির স্বার্থে গোপনতার আবরণ উন্মোচন করা উচিত? আপনারা কি মনে করেন যে, পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত তথ্যগুলি মুক্ত জগতের অর্থনীতির উন্নতির জন্য মিত্র শক্তি-গুলিকে জানানো উচিত? সত্যকার শান্তির অভাবে আপনি কি মনে করেন যে, আমাদের পারমাণবিক শক্তি কর্ম্মসূচী এতদূর অগ্রসর করা উচিত যাতে যারা আমাদের বা আমাদের মিত্রদের আক্রমণ করবে তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য যতগুলি অস্ত্র দরকার তা আমাদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হবে? আপনি কি মনে করেন যে, পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ বাস্তবে পরিণত করবার জন্য শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা প্রয়োজন এবং তার জন্য সরকারী একচেটিয়া অধিকার কিছু শিথিল করা দরকার?

আপনারা কি এইসমস্ত বিষয়ে বা এর কোনও একটি বিষয়ে এমন গভীর প্রেরণা অনুভব করেন যাতে আপনার মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে আপনি কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেন? স্বার্থত্যাগের রূপ হয়ত হবে গাঞ্জনা দেওয়া, নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, বাদ-প্রতিবাদে যোগ দেওয়া, পৌর প্রতিষ্ঠান-গুলিতে যোগ দেওয়া, আপনাদের প্রতিনিধি কংগ্রেস সদস্যবৃন্দকে চিঠি লেখা অথবা নিজে অনুশীলন দ্বারা এবং নিজের পরিবারের, প্রতিবেশীদের ও বন্ধুদের মধ্যে বুদ্ধিমানের মত বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা।

আপনি যদি এগুলির কোনও একটি করতে উৎসাহ অনুভব না করেন, তা'হলে আপনি পারমাণবিক যুগে বেঁচে থেকে তার সুবিধাগুলি ভোগ করার যোগ্য নন্। তাছাড়া এরূপ না করলে আপনি পৃথিবীকে পারমাণবিক যুদ্ধ ও বিলুপ্তির দিকেই যেতে দেবেন। বর্ত্তমানে ঔদাসীন্য বা বিতৃষ্ণা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের গণতন্ত্রে নীতি নির্দ্ধারণের কাজে প্রত্যেক নাগরিকেরই অংশগ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলে চিরকালই মনে করা হয়, অধিকন্তু যে জগতে পরমাণু মুক্ত রয়েছে, সেখানে নাগরিকের এই কর্ত্তব্য আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ সম্প্রতি এমন একটি কক্ষে প্রবেশ করেছে যার দরজায় 'পারমাণবিক যুগ' এই পরিচয়পত্র লাগনো আছে। আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছি বটে, কিন্তু ঘরটি এত বড় ও এত অল্পালোকিত যে আমরা এর মধ্যে কি আছে ঠিক ঠাহর করতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা চৌকাট ডিঙ্গিয়ে ফেলেছি— আর ফিরবার উপায় নেই। এখন আমাদের সাহসের সঙ্গে এবং যতখানি স্থির মস্তিষ্কে পারি অগ্রসর হতে হবে। আমেরিকাবাসীরা যখন পারমাণবিক বোমা পৃথিবীতে প্রয়োগ করেছে, তখনই পারমাণবিক যুগে নেতৃত্ব করবার দায়িত্ব তারা নিয়েছে। যদি সুষ্ঠুভাবে একাজ করতে হয়, তা'হলে আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতৃগণের পক্ষে প্রত্যেকটি নাগরিকের নিকট থেকে সাহায্য ও উপদেশ লাভ একান্ত প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট—ক

শান্তির স্বার্থে পরমাণু শক্তি

[রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল মিঃ ড্যাগ হ্যামারশীল্ডের আমন্ত্রণক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার ১৯৫৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে এক বক্তৃতা দেন। প্রেসিডেণ্টের সেই ঐতিহাসিক ভাষণটির পূর্ণ বিবরণ নিম্নে মুদ্রিত হ'ল। শান্তিপূর্ণ লক্ষ্য সাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকার পারমাণবিক সম্পদ বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে এক চতুর্মুখী আন্ত-র্জাতিক পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলিই এই ভাষণে উপস্থাপিত হয়েছে।]

মাননীয় প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী জেনারেল এবং প্রতিনিধিবৃন্দ :

সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাদানের জন্য সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ডের আমন্ত্রণ যখন বারমুডায় আমার নিকট পৌঁছেছিল, আমি তখন গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সঙ্গে বর্ত্তমান বিশ্বের কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে পর পর কয়েকটি আলোচনা সবেমাত্র আরম্ভ করছিলাম।

বারমুডা সম্মেলন সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অনুক্ষণ আমার মনে হয়েছে, অচিরেই এক মহান সম্মান আমি লাভ করতে চলেছি। আজ এখানে রাষ্ট্র-সংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়ে আমি সেই সম্মানের অধিকারী হয়েছি। আপনাদের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে উঠে আমি যেমন সম্মানিত বোধ করছি তেমনি এই পরিষদের দিকে তাকিয়ে আমি আনন্দও বোধ করছি।

একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের উপর এতগুলি লোক এতখানি আশা পোষণ করে

থাকে ইতিহাসে এর আগে আর কোনও দিন দেখা যায়নি। অতীতের তমসাচ্ছন্ন দিনগুলিতে আপনাদের আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ফলে এই আশার কিছুটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের আরও বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, আরও বিরাট কার্য্য সম্পাদন করতে হবে। ঐ সকল কাজ আমরা সম্পাদন করতে পারব বলেই আশা করি। এবং সেই আশাতে আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি যতদিন এই পদে অধিষ্ঠিত আছি, ততদিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে যাবে। সমস্ত জাতির জন্য পৃথিবী জুড়ে স্থায়ী শান্তি গড়ে তোলা এবং প্রতিটি মানুষের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি সৃষ্টি করার কাজে আপনাদের আস্থা অটুট থাকবে এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা একে সমর্থন জানাবো।

স্পষ্টতঃই এই মুহূর্তে এখানে বারমুডা সম্পর্কে আমেরিকার পক্ষ থেকে এক-তরফা বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না। এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আপনাদের সনদে যে বিশ্বশান্তি ও মানবিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে সেই মনোরম দ্বীপে বসে সেই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই আমরা আলোচনা চালিয়েছি। সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও আশাব্যঞ্জক কতগুলি কথা মুখে বললে কোনও লাভ হবে না।

সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা কার্য্যে যারা আমাকে সাহায্য করে থাকেন, তাদের মনে এবং আমার মনে বহুদিন পূর্ব্বেই যে সকল চিন্তা উদিত হয়েছে এবং যা আমি সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা-বাসীদের নিকটই বলব বলে প্রথমতঃ স্থির করেছিলাম, তার কিছু কিছু আপনাদের নিকট বলব।

আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীতে যদি কোন বিপদ দেখা দিয়ে থাকে তা'হলে সকলে সমানভাবে সেই বিপদ বরণ করে নিয়েছে এবং যদি কোন

একটি জাতির মনে আশা দেখা দিয়ে থাকে, সেই আশায় সকল জাতিরই অংশ থাকা উচিত। আমি জানি, আমার এই গভীর বিশ্বাসে আমেরিকাবাসীরাও বিশ্বাসী।

সর্ব্বশেষে, বর্ত্তমান বিশ্বের উত্তেজনা স্বল্পতম মাত্রায়ও নিরসনের জন্য যদি কোন পরিকল্পনা পেশ করতেই হয় তাহ্‌লে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের মত যোগ্য স্থান আর কোথায় পাওয়া যাবে?

আজ এমন এক ভাষায় আমাকে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে, যা একদিক থেকে নূতন। সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করেই যাঁর এতখানি জীবন কেটেছে তাঁকে এই ভাষা কখনও ব্যবহার না করতে হলেই আমি সুখী হতাম।

এই নূতন ভাষাটি হ'ল পরমাণু যুদ্ধের ভাষা।

পারমাণবিক যুগ এরূপ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যে, এই অগ্রগতি সম্পর্কে অন্ততঃ কিছুটা ধারণা পৃথিবীর প্রত্যেকটি নাগরিকেরই থাকা উচিত। কারণ আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই পারমাণবিক যুগের এই অগ্রগতি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। স্পষ্টতঃই বিশ্ববাসী যদি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শান্তির সন্ধান করতে চায় তা'হলে আজিকার বিশ্বে মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর ধারা তাদের উপলব্ধি করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকেই মাত্র আমি পারমাণবিক শক্তি ও সেই শক্তিসঞ্জাত বিপদের কথা বর্ণনা করতে পারি। কারণ আমি যতটুকু জানি তাতে এই অভিজ্ঞতা বিতর্কাতীত। কেবল কোন একটি বিশেষ জাতির দিক থেকে নয়, সমগ্র পৃথিবীর দিকথেকেই যে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, একথা আবার এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষাকার্য্যে ব্রতী হয়।

১৯৪৫ সালের সেইদিন থেকে ঐ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক

বিস্ফোরণ সংক্রান্ত ৪২টি পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করে।

পারমাণবিক যুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল তার তুলনায় ২৫ গুণেরও অধিক বিস্ফোরণ শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক বোমা আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা ও ঐ জাতীয় অস্ত্রাদির বিস্ফোরণ ক্ষমতা, এই সকল পারমাণবিক অস্ত্রের তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক।

আজ যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র পুঞ্জীভূত করেছে ও এখনও উৎপাদন করছে তার বিনাশ ক্ষমতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ব্যবহৃত সকল বোমা ও গোলা বারুদের শক্তির মোট পরিমাণকেও বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। যে কোনও বিমানঘাটি অথবা যে কোনও বিমানবাহী জাহাজ থেকে আজ যে কোনও একটি বৈমানিকদল তাদের নাগালের মধ্যে অবস্থিত যে কোনও লক্ষ্য স্থলে এত পারমাণবিক বোমা বহন করে নিয়ে যেতে পারে যার বিনাশ ক্ষমতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটেনের উপর বর্ষিত সমুদয় বোমার চেয়ে বেশী।

বিভিন্ন রকমের ও আকৃতির পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারও কম উল্লেখযোগ্য নয়। পারমাণবিক অস্ত্রাদির এত উন্নতি হয়েছে যে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীও এখন প্রয়োজনানুসারে উহা ব্যবহার করতে পারে বলে বলা যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্থল, বিমান ও নৌ সৈন্যদল সকলেই সামরিক প্রয়োজনে এই অস্ত্রটি ব্যবহার করবার কৌশল আয়ত্ত করেছে।

কিন্তু ভয়াবহ পারমাণবিক শক্তির তথ্য যে কেবলমাত্র আমাদের হাতেই রয়েছে তা নয়। প্রথমতঃ, এই গোপন তথ্য আমাদের মিত্র ও সহযোগী রাষ্ট্র গ্রেটব্রিটেন ও কানাডার হাতেও রয়েছে। পারমাণবিক বোমা মূলতঃ আমরা আবিষ্কার করলেও ঐ সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ এই দিক থেকে আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নও পারমাণবিক শক্তির গোপন তথ্য আয়ত্ত করেছেন। এই দেশটি আমাদের জানিয়েছেন যে, গত কয়েক বছরে তারা পারমাণবিক

অস্ত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিপুল সম্পদ নিয়োগ করেছেন। ঐ সময়ে তাঁরা কতগুলি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন, যার মধ্যে অন্ততঃ একটি থার্মো-নিউক্লিয়ার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন এক সময়ে পারমাণবিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থেকে থাকলেও কয়েক বৎসর হ'ল সেই অধিকারের অবসান হয়েছে। এই পথে আগে অগ্রসর হওয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রের পরিমাণের দিক থেকে আমরা এগিয়ে আছি বটে, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিষয়টি বিচার করলে আরও দুটি অধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ তথ্য চোখে পড়ে।

প্রথমতঃ বর্ত্তমানে যে পারমাণবিক জ্ঞান এই পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্র আয়ত্ত করেছে তা কালে কালে অন্যেরাও, হয়তো বা সকলেই, আয়ত্ত করবে।

দ্বিতীয়তঃ, অধিক সংখ্যায় পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েও এবং উহার সাহায্যে ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকলেও, অতর্কিত আক্রমণের ফলে ধনসম্পত্তির যে সমূহ ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটবে তা নিরোধ করা যাবে না।

স্বাধীন দুনিয়া এসব সত্য জানে বলেই সম্ভবতঃ তারা সতর্কতামূলক প্রতিরক্ষার আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠেছে। এই সকল পরিকল্পনা দ্রুত সুসম্পন্ন ও প্রসারিত করা হবে।

কিন্তু কেউ যেন ভেবে না বসেন, অস্ত্রসজ্জা ও প্রতিরক্ষার আয়োজনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করলেই কোনও দেশ তার নগর বা নাগরিকদের সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারবে। পারমাণবিক বোমার ভীতি-প্রদ অস্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে এই প্রকার কোন সহজ সমাধানের পন্থা নেই। অতি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকলেও আক্রমণকারী রাষ্ট্রের হাতে অতর্কিত আক্রমণের জন্য যদি প্রয়োজনীয় সর্ব্বনিম্ন সংখ্যক পারমাণবিক বোমা থাকে, তবে সেই রাষ্ট্রটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে বোমা নিক্ষেপ করে হয়ত বিপুল ক্ষতি সাধনে সক্ষম হবে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের উপর যদি এই প্রকার পারমাণবিক আক্রমণ চালানো হয়

তবে দেশরক্ষা সম্পর্কে আমরা অতিক্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করব এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এই আক্রমণের সম্মুখীন হব। আমি যদি বলি যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আক্রমণকারীর ভীষণ ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম, আমি যদি বলি যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণকারী দেশটিকে মরুভূমিতে পরিণত করতে সক্ষম তবে সত্য কথাই বলা হবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সত্যিকারের আশা ও উদ্দেশ্য তাতে প্রকাশিত হবে না।

এ সকল কথা ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকার অর্থ ইহা চূড়ান্তভাবে স্বীকার করে নেওয়া যে, পারমাণবিক শক্তিতে শক্তিমান্ দু'ইটি বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ পরস্পর অনির্দ্দিষ্টকাল আস্ফালন করে চলবে এবং অসহায় বিশ্ব ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে তা নিরীক্ষণ করতে থাকবে। নিশ্চেষ্ট থাকার অর্থ ইহা স্বীকার করে নেওয়া যে, সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যুগ যুগ ধরে মানবজাতির যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা বিলুপ্ত হবে। এবং মানুষকে পুনরায় সেই আদিম বর্বর যুগে ফিরে যেতে হবে, যেখান থেকে তাকে উন্নত রুচিবোধ এবং ন্যায় ও বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য নূতন করে সংগ্রাম সুরু করতে হবে। কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই এরূপ অবস্থার মধ্যে বিজয়ের কোন লক্ষণ দেখতে পারেন না। মানুষের এই অবনতি ও ধ্বংসের সঙ্গে নিজের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রাখতে কেউই ইচ্ছা করেন না।

ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ ধ্বংসকারীদের নাম লিপিবদ্ধ থাকলেও সমগ্র ইতিহাস মানুষের অনন্ত শান্তি কামনা ও মানুষের ঈশ্বরদত্ত গঠনশক্তির কথাই প্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্র চিরকাল এই সমগ্র ইতিহাসকেই অনুসরণ করে চলবে, ইতিহাসের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠাকে নয়। আমার দেশ সৃষ্টিকামী হতে চায়, ধ্বংসকামী নয়। সে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মতৈক্যের প্রতিষ্ঠাই কামনা করে, যুদ্ধ নয়। সে স্বাধীন থাকতে চায় এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদের জীবনযাত্রার পথ বেছে নেবার অধিকার সমানভাবে ভোগ করুক, এই আশাই পোষণ করে।

সুতরাং আমার দেশের লক্ষ্য হ'ল, এই বিভীষিকার তিমিরাবৃত কক্ষ থেকে আমাদের সকলকেই আলোকের রাজ্যে উপনীত হতে সাহায্য করা এবং এমন একটি পথ আবিষ্কার করা যে পথে সর্ব্বত্র সকল দেশের মানুষের মন, মানুষের আশা ও মানুষের আত্মা শান্তি, সুখ ও কল্যাণের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

এই পথের সন্ধানকালে আমাদের ধৈর্য্যের অভাব ঘটলে চলবে না।

আমি জানি, আজ আমাদের মত বিভক্ত কোনও দুনিয়ায় শুধু একটিমাত্র নাটকীয় কাজ করেই মুক্তি আনা সম্ভব নয়।

আমি জানি, পৃথিবীতে যে শান্তি ও পারস্পরিক আস্থার একটা নূতন অবস্থা এসেছে তা সত্য সত্যই উপলব্ধি করতে এখনও বহু সময় লাগবে ও বহু সোপান অতিক্রম করতে হবে।

কিন্তু আমি জানি, আমাদের এখনই এই মুহূর্তে সকলের আগে এই ব্যবস্থা-গুলিই গ্রহণ করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিগত কয়েকমাস ধরে এই ব্যবস্থা-গুলিই গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছে। আলাপ আলোচনা করতে আমরা পরাঙ্মুখ একথা কেউ যেন না বলেন। বিভক্ত জার্ম্মাণীর সমস্যাবলী নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আপস আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অনুরোধ দীর্ঘদিন নথিভুক্ত রয়েছে। অষ্ট্রীয়া চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্যও এই একই তিনটি রাষ্ট্রের অনুরোধ দীর্ঘকাল নথিভুক্ত হয়ে আছে। আর সেই একই নথিতে আজও লিপিবদ্ধ রয়েছে কোরিয়া সমস্যা মীমাংসার জন্য রাষ্ট্র-সংঘের অনুরোধ।

অতি সম্প্রতি আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট থেকে যে উত্তর পেয়েছি তাতে কার্যতঃ একটি চতুঃশক্তি বৈঠক আহ্বানের স্বপক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। এই লিপিটীতে গ্রহণের অযোগ্য পূর্ব্বপ্রদত্ত সর্ত্ত নেই দেখে আমাদের মিত্র গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আমরাও আনন্দিত হয়েছি।

বারমুডা থেকে আমাদের সম্মিলিত ইস্তাহারেই আপনারা জানতে পেরেছেন,

সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স সঙ্গে সঙ্গেই একমত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার আশা ও আন্তরিকতা নিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। সেই সম্মেলনে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সার্থক পন্থা উদ্‌ভাবন করা যায় একমাত্র সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করব। কেননা, আন্তর্জাতিক শঙ্কা ও উত্তেজনা হ্রাস করতে হলে এটাই একমাত্র সত্যিকারের পথ।

আমরা কখনও এইরূপ প্রস্তাব করি নি যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের ন্যায্য দাবী বিসর্জ্জন দিক এবং সে প্রস্তাব আমরা কখনও করব না।

আমরা কখনই বলব না, রাশিয়ার জনগণ আমাদের শত্রু, সুতরাং তাদের সঙ্গে কোনও বন্ধুত্বপূর্ণ বা ফলপ্রসূ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আমাদের নেই।

বরং আমরা আশা করি যে, এই আসন্ন সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপিত হোক যার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জনগণের মধ্যে অবাধ মেলামেশা সম্ভব হবে। আস্থাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে বুঝাপড়ার মনোভাবের প্রয়োজন, সেই মনোভাব সৃষ্টির এটিই একমাত্র নিশ্চিত মানবিক পথ।

পূর্ব্ব জার্ম্মাণী, অধিকৃত অষ্ট্রিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে যে অসন্তোষ আজ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে সেই বিক্ষোভ ও অসন্তোষের পরিবর্ত্তে স্বাধীন ইউরোপের দেশসমূহ যাতে একটি সুসমঞ্জস পরিবাররূপে গড়ে উঠতে পারে তাই আমাদের কাম্য। আমরা চাই এরূপ পরিবারের কেউই রাশিয়ার জনগণের পক্ষে তো দূরের কথা, কারো পক্ষেই কোন শঙ্কার কারণ হয়ে উঠবে না।

এশিয়ায় মার্কিণ লক্ষ্য

এশিয়া আজ দারিদ্র্য, সংঘাত ও গোলযোগের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এশিয়াবাসী জনগণের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের শান্তিপূর্ণ সুযোগ যাতে তাদের মেলে তাই আমরা চাই।

এটা কেবল মিথ্যা বাক্য বা অসার কল্পনা নয়। আমার এই সকল বক্তব্যের পেছনে সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছে এমন কয়েকটি দেশের কাহিনী রয়েছে। কোন যুদ্ধের ফলে তারা এই স্বাধীনতা পায়নি, পেয়েছে শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে বা বিনাসর্তে মঞ্জুর করার ফলে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে সাময়িকভাবে দুর্গত ও আর্ত মানুষ পাশ্চাত্ত্যের জাতিগুলির নিকট থেকে সানন্দে দেওয়া সাহায্য পেয়েছেন, একথাও লেখা হয়ে রয়েছে।

এ সবই শান্তির অনুকূল কাজ। শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প জাঁক করে ঘোষণা করা বা সেরকম নানা প্রতিশ্রুতির চেয়ে এসব কাজ অনেক বেশী সরব।

আমি কেবল অতীতের প্রস্তাব সমূহের পুনরুল্লেখ এবং অতীত কার্য্যাবলীর পুনরালোচনা করেই ক্ষান্ত হতে চাই না। এখন সময়ের গুরুত্ব এত বেশী যে, যত অস্পষ্টভাবেই বোধগম্য হোক না কেন, শান্তির প্রত্যেকটি নূতন পথ খুঁজে দেখতে হবে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্ততঃ একটি নূতন পথ রয়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যে পথের অনুসন্ধান এখনও আমরা করিনি। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদই সেই পথের সন্ধান দিয়েছে।

১৯৫৩ সালের ১৮ই নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত একটি প্রস্তাবে যে কথা বলা হয়েছে আমি সেটা উদ্ধৃত করছি :

নিরস্ত্রীকরণ কমিশন যেন প্রধানভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। কমিটি বেসরকারীভাবে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান সন্ধানের চেষ্টা করবেন। এবং ১৯৫৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে সে সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন।

পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা কেবল শান্তির পক্ষেই শঙ্কাজনক নয়, সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের পক্ষেও শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী এই সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ

নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে প্রধানভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বেসরকারী-ভাবে আলাপ অলোচনা করতে এখনই প্রস্তুত আছে।

এই সকল বেসরকারী ও কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা নূতন ভাবধারা প্রকাশ করবো।

সামরিক প্রয়োজনে প্রস্তুত পারমাণবিক উপকরণসমূহের হ্রাস ঘটানো অথবা সে সব নষ্ট করে দেওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র কাম্য নয়।

কেবল সৈনিকদের হাত থেকে এই অস্ত্রটি সরিয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে না। এ অস্ত্র তুলে দিতে হবে তাঁদেরই হাতে, যাঁরা একে সামরিক আবরণ থেকে মুক্ত করে শান্তির কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার কৌশল বার করতে পারবেন।

পারমাণবিক সমরশক্তির এই গতি যদি পরিবর্ত্তিত করা যায় তবে বিশ্বের এই বৃহত্তম বিধ্বংসী শক্তিকে যে সর্ব্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত করা যেতে পারবে সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সুনিশ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্র আরও জানে, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে শান্তির সময়ে যে কল্যাণজনক অনেক কিছু করা যায় সেটা শুধু ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয়। ইতো-মধ্যেই সেটা প্রমাণিত হয়েছে এবং এখনই তা করা সম্ভব। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারগণের কাছে তাদের কাজের জন্য যদি উপযুক্ত পরিমাণে বিভাজন যোগ্য উপকরণ দেওয়া যায় তবে তারা যে একদিন তাকে সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

যেদিন পরমাণু সম্পর্কে জনগণের অথবা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোন গভর্ণ-মেণ্টের কোন শঙ্কা থাকবে না, সেই দিনটিকে ত্বরান্বিত করবার জন্য কতিপয় পন্থা এখনই অবলম্বন করা যেতে পারে।

সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি যে, প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্টসমূহের কাছে যে সকল বিভাজনযোগ্য উপকরণ ও ইউরেনিয়াম সঞ্চিত আছে সেসব থেকে ঐ সকল রাষ্ট্র সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে যতটুকু সম্ভব উপকরণ একটি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থাকে প্রদান করবেন। এই কাজটি এখনই

শুরু করতে হবে এবং পরেও চালিয়ে যেতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের অধীনে এইরূপ একটি সংস্থা স্থাপিত হবে বলে আমরা আশা করি।

ঐ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থায় সহযোগী বিভিন্ন রাষ্ট্রের দেয় অংশের পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারণের কাজ বেসরকারী আলাপ আলোচনার সাহায্যে সম্পন্ন করাই সমীচীন হবে। এরূপ আলাপ আলোচনার উল্লেখ আমি পূর্ব্বেই করেছি।

এই নূতন পন্থা আবিষ্কারের দায়িত্ব আন্তরিকতার সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করতে প্রস্তুত। অপর কোনও অংশীদার যদি যুক্তরাষ্ট্রের মতই আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজে যোগদান করেন তাহলে সহকর্মীরূপে যুক্তরাষ্ট্রকে দেখতে পাবেন যে সে অনুদার কিংবা যুক্তিবিচারহীন নয়।

এই পরিকল্পনার একেবারে সূচনায় এবং প্রথমদিকে সকলের দেয় অংশের পরিমাণ যে কম হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা হলেও এই পরিকল্পনাটির এই হিসাবে বিশেষ মূল্য রয়েছে যে, সারা বিশ্ব জুড়ে পারমাণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও পর্যাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বজনগ্রাহ্য একটি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে গেলে যে আনুষঙ্গিক ঈর্ষা ও সন্দেহ দেখা দেয় তা থেকে সেটা মুক্ত থাকবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র যেসব তেজস্ক্রিয় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পরমাণু শক্তি সংস্থার হাতে জমা দেবেন সেসব সুরক্ষিত ও আবদ্ধ রাখার দায়িত্ব ঐ সংস্থার উপরেই ন্যস্ত করা যাবে। আমাদের বৈজ্ঞানিকদের উদ্‌ভাবনী প্রতিভাবলে এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা যাবে যাতে ঐ রকম তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদির রক্ষণাগারের উপরে হঠাৎ চড়াও হয়ে সেসব দখল করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে।

শান্তিকালীন অবস্থায় মানুষের নানা কাজে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থকে যাতে ব্যবহার করা যায় সেই রকম পথ উদ্ভাবন করাই এই পরমাণু শক্তি সংস্থার অপেক্ষাকৃত গুরুতর দায়িত্ব হয়ে দাড়াবে। কৃষিকার্য্যে, চিকিৎসার কাজে ও অন্যান্য শান্তিপূর্ণ কার্য্যকলাপের ক্ষেত্রে সহায়করূপে পরমাণু শক্তিকে প্রয়োগ

করবার জন্য বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ লক্ষ্য হবে, যেসব দেশে বৈদ্যুতিক শক্তির অপ্রাচুর্য্য রয়েছে সেই সব দেশে পর্য্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। সহযোগী রাষ্ট্রগুলি এভাবে বিশ্বমানবের ত্রাসবর্ধনে নয়, প্রয়োজন সাধনেই তাদের শক্তির কিয়দংশ দান করবেন।

পরমাণু শক্তিকে শান্তিকালীন কাজে প্রয়োগের পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রধান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগদান করা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গর্ব্বের বিষয় বলেই বিবেচিত হবে, যুক্তরাষ্ট্র সানন্দেই তা করবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন যে এই সংশ্লিষ্ট প্রধান রাষ্ট্রগুলির অন্যতম হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে নিয়ে যদি ঐ রকম কোনও পরিকল্পনা রচিত হয় তাহলে আমি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাছে সেটি উপস্থাপিত করবো এবং সে প্রস্তাব সমর্থিত হবে বলেই আশা করি।

প্রথমতঃ—বিভাজনযোগ্য পদার্থাদির শান্তিকালীন সার্থক ব্যবহার, বিশেষ ভাবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি ভাবে হতে পারে সে সম্বন্ধে সমুদয় রাষ্ট্রেই তদন্তের ব্যবস্থা করা হোক।

দ্বিতীয়তঃ—পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে সঞ্চিত পরমাণু শক্তির বিপুল ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা হ্রাসের কাজ আরম্ভ করা হোক।

তৃতীয়তঃ—বর্ত্তমান উন্নতযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রবল শক্তিশালী সমুদয় রাষ্ট্রই সমরোপকরণ প্রস্তুত করা অপেক্ষা মনুষ্যোচিত উচ্চাভিলাষ সাধনের আগ্রহকেই যে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকে, এটা পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সকল জাতি যাতে দেখতে পারে তার সুযোগ দান করা হোক।

চতুর্থতঃ—শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার একটা নূতন পন্থা অনুসরণ করা হোক। সরকারী এবং বেসরকারীভাবে নানা আলোচনার সাহায্যে যে সকল কঠিন সমস্যার সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন অন্ততঃ সেইগুলির জন্য একটা পথ নির্দ্দেশ করা হোক। ভীতিসঞ্জাত যে অচল মনোভাব বিশ্ববাসীকে আজ

দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছে তা থেকে মুক্ত হয়ে উন্নতি ও শান্তির পথে অগ্রসর হতে হলে তা করতে হবেই।

পরমাণু বোমার আতঙ্কে আচ্ছন্ন এই পটভূমিকায় যুক্তরাষ্ট্র কেবল তার শক্তির পরিচয় দিতেই ইচ্ছুক নয়, শান্তির কামনা এবং শান্তিলাভের আশাও যে সে করে সেটাও সে জানাতে চায়।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যে সব সিদ্ধান্ত করা হবে সে সবের ফলাফল এই পরিষদে, পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রের রাজধানীতে এবং সামরিক কেন্দ্রীয় দপ্তরে, শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সকল দেশের মানুষের মনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ঐ সব সিদ্ধান্ত যেন এই পৃথিবীকে ভয়মুক্ত করে শান্তির রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করবার প্রাকালে আপনাদের তথা সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: পারমাণবিক শক্তির উভয়সঙ্কট সমাধানের জন্য সাহায্য করতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকবে—মানুষের নব নব উদ্ভাবনের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা যাতে তার মৃত্যুর কারণরূপে ব্যবহৃত না হয়ে তার জীবনকে গড়ে তুলবার পবিত্র ব্রতে উৎসর্গীকৃত হয় সেজন্য সে তার সমস্ত অন্তর ও মন সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করবে।

পরিশিষ্ট — খ

শান্তির স্বার্থে পারমাণবিক শক্তি

[প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের ভাষণের পর (পরিশিষ্ট-ক) মিঃ গর্ডন ডীন লিখিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি 'অ্যাটলান্টিক মান্থলি' নামক বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।]

পারমাণবিক যুদ্ধের চূড়ান্ত বিভীষিকা এবং পারমাণবিক শান্তির মহতী সম্ভাবনা ও আহ্বানের দিকে বিশ্বমানবের চিন্তাধারাকে চালিত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তৃতামঞ্চ থেকে এভাবে মার্কিণ প্রেসিডেন্টের একটি ভাষণ দেবার প্রয়োজন ছিল। সাত বছর আগে বার্ণার্ড বারুকের অনুরূপ বাণীর কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি তখন বলেছিলেন, 'আমরা এখানে দ্রুত চলন্ত মানুষ ও মৃত মানুষের মধ্যে বেছে নিতে এসেছি।' প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারও স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে জগতের পক্ষে এই নির্ব্বাচন তাড়াতাড়ি করে ফেলাই ভালো। সাত বছর ধরে পরমাণু ঘটিত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ নিরাশায় পরিণত হয়েছে, অথচ ক্রমবর্দ্ধমান ধ্বংসশক্তি-বিশিষ্ট বোমার ভাণ্ডার লৌহযবনিকার উভয় দিকেই জমে উঠছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে নানা প্ররোচনামূলক ঘটনা সৃষ্টি করা হলেও যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসার জন্য পারমাণবিক বোমার ব্যবহার করেনি, যদিও, স্বল্পকালের জন্য হলেও, আমাদের নিকট ছাড়া আর কোন শক্তির কাছেই পারমাণবিক বোমা ছিল না। ইহা নৈতিক প্রভাবের ফল এবং আমার বিশ্বাস সোভিয়েট রাশিয়াও ভালো করেই জানত যে, আমাদের বিচার-বিবেচনার উপর নৈতিক প্রভাব কতখানি কার্য্যকরী। চেকোশ্লোভাকিয়ায় আকস্মিকভাবে

শাসনক্ষমতা দখল, উত্তর কোরিয়ায় আক্রমণ, চীনা বিপ্লব, বার্লিন অবরোধ এবং বলকান সন্ধি সর্ত্তগুলি নির্ম্মমভাবে অমান্য করার মধ্যে তারা ঐ জ্ঞানের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করেছিল। নাগাসাকি ও হিরোসিমার যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বিশ্বে প্রকট হয়, তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে আমরা স্পষ্টই অনিচ্ছুক ছিলাম, সুতরাং রাশিয়ানরা তাদের কার্য্যাবলীতে অনেকখানি স্বাধীনতা পায় যা তারা অন্যথায় পেত না। ইতোমধ্যে তারা আবার নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র কর্ম্মসূচী বিনাবাধায় প্রয়োগ করার অবকাশও পেল।

১৯৪৮ সাল নাগাদ পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে রাশিয়ানদের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন বোঝাপড়ার আশা অতি ক্ষীণ। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে, রাশিয়ানরা তাদের প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করেছে। এতে পরমাণু বোমায় আমাদের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হ'ল। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তার অস্ত্রভাণ্ডারকে দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তুলে আক্রমণের আশঙ্কার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন উপায়ও রইল না। তাই করা হ'ল। যদিও আমাদের এই প্রচেষ্টার চরম পরিণতিকে শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে লাগানো যায়, তবুও সেই বিরাট প্রচেষ্টাকে, যাতে প্রায় সাড়ে সাত শত কোটি ডলার ব্যয় হয়, শুধু শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের নিরিখেই সঙ্গত বলে প্রমাণ করা যায় না। কারণ তখন স্পষ্টই তাড়াতাড়ি বোমা তৈরীর জন্যই ঐ বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল।

রাশিয়ানরা প্রথমে বিশ্ববাসীর কাছে বলতে চেয়েছিল যে, তাদের পারমাণবিক কর্ম্মসূচী শুধু শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যই—পর্ব্বত অপসারণ, নদীর গতি পরিবর্ত্তন এবং মরুভূমিকে উর্ব্বরা করার জন্যই তাদের এই কর্ম্মসূচী; কিন্তু ইহা মিথ্যা এবং যখন আমরা জানতে চাইলাম যে, কোথাকার নদী এবং পর্ব্বত, তখন সেই প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যাকে ঢাকবার একটিমাত্র আবরণই পাওয়া গেল—তা হচ্ছে নীরবতা। ১৯৫১ সাল নাগাদ রাশিয়ানরা যখন আরও দু'টি পারমাণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণ করল, তখন স্টালিন স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে,

এটা অস্ত্র পরীক্ষাই এবং রাশিয়ানরা নূতনরূপ পারমাণবিক অস্ত্র উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছে।

গত গ্রীষ্মে সোভিয়েট রাশিয়া তাঁদের প্রথম থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটায়। কাজেই পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ১৯৪৬ সালেও যেখানে ছিলাম, ১৯৫৩ সালের হেমন্তেও সেইখানেই রইলাম। এ বিষয়ে চিন্তাকে উজ্জীবিত করার জন্য কয়েকমাস আগে আমি উল্লেখ করি যে, সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। রাশিয়ানরা আমাদের ভীষণভাবে আঘাত করতে পারে এবং দু'বছরের মধ্যে তারা আমাদের শিল্পজীবি লোকসংখ্যার বেশ বড় একটা অংশ ধ্বংস করার শক্তির অধিকারী হবে। অন্য অনেকে বলেন যে, এখন স্পষ্টবাদিতার নীতি গ্রহণ করাই ভালো এবং প্রেসিডেন্ট স্বয়ং প্রকাশ করুন, ঐসকল অস্ত্রের ধ্বংসকারী শক্তি কতখানি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কিরূপ অন্ধকার।

এই পটভূমিকায় এবং ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে প্রেসিডেন্ট ঐ ভাষণ দেবার সিদ্ধান্ত করেন এবং অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, তিনি ঐ ভাষণ দিয়েছেন। তিনি আধুনিক পারমাণবিক বোমার শক্তির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন (পাঁচ লক্ষ টন টি এন টির সমান)। তিনি রাশিয়ার পারমাণবিক প্রচেষ্টার উল্লেখ করেছেন, উহা যে বেশ শক্তিশালী ইহা প্রতীয়মান। তিনি আমেরিকার শান্তিকামনার কথা পুনরায় উল্লেখ করেছেন, বলেছেন—তারা সৃষ্টি চায়, ধ্বংস চায় না। অবশ্য এই সঙ্গে তিনি একথাও স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, কেউ যদি আমাদের আক্রমণ করতে সাহস করে তা'হলে প্রত্যুত্তরে আমরা তার কতখানি ধ্বংসসাধনের ক্ষমতা রাখি।

তারপর তিনি একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছেন। এই পরিকল্পনায় এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা পারমাণবিক ব্যাপারে মূলতঃ সংশ্লিষ্ট, সেইসব জাতি নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার চরম সমাধানের জন্য প্রারম্ভিক ব্যবস্থার সূচনা করতে পারেন। এই প্রস্তাব দ্বারা বর্ত্তমানে অন্ততঃ যবনিকার দুই পারের বোমার ভাণ্ডারের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হবে না। কিন্তু এর দ্বারা স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থের

ভবিষ্যৎ বোমার মধ্যে সঙ্করণের গতি হ্রাস পাবে।

এর দ্বারা রাষ্ট্রসংঘের আওতায় স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থের এক আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার স্থাপিত হবে, যা থেকে সকল দেশই আবশ্যক মত গবেষণা পরীক্ষা ও আইসোটোপ বা ক্ষমতাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে রি-অ্যাক্টর নির্ম্মাণের জন্য স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ সংগ্রহ করতে পারে।

[২]

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এই প্রস্তাব নিয়ে যেসকল আলোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কিভাবে ঐ প্রস্তাবগুলি প্রভাবান্বিত করবে তা নিয়ে। এই প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যকরী করার যে পদ্ধতি তা কি তারা বিশ্বস্তভাবে মেনে চলবে? সমস্ত বিশ্ব অবশ্য আশা করবে যে, তারা মেনে চলবে। তারা যদি 'পানমুনজন' সম্মেলনের মত অনন্তকাল ধরে আলোচনা চালিয়ে যায়, তা'হলে বিশেষ দুঃখের কথা হবে।

কিন্তু প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা তাঁর বাণীর একটি বিশেষ সম্পাদ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন বলে আমার মনে হয়। ইহা নিম্নলিখিত অংশটির মধ্যে আছে :—

'যদি পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি পরীক্ষার জন্য এবং সে পরীক্ষা থেকে আরও উন্নত জ্ঞান আহরণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ হাতে পান, তা'হলে তাঁদের ক্ষমতা যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী হতে পারে এবং আর্থিক দিক থেকেও তা সম্ভব হতে পারে তাতে কার সন্দেহ থাকতে পারে?'

উপরিউক্ত যুক্তির কোন ব্যাঘাত ঘটে না যদি বিশ্বের, সকল বিজ্ঞানী না হলেও যবনিকার এপারে যে বড় অংশ আছেন অন্ততঃ তাঁরা যদি নিজেদের কল্পনাকে কার্য্যকরী করার স্বাধীনতা পান।

মার্কিণ প্রেসিডেন্টের কথাগুলির বাক্যগত অর্থ যা বুঝায়, আমার মতে তা ছাড়াও উহার মধ্যে আরও বেশী কিছু নিহিত আছে। প্রেসিডেন্টের ভাষণে

এই মর্মার্থই প্রচ্ছন্ন আছে যে আমরা শুধু স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থগুলিই আন্ত-র্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে বিতরণ করব না, উপরন্তু বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও যান্ত্রিক কৌশলও শেখাবো। পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে যে কোন দেশই গবেষণার জন্য সামান্য পমিমাণ স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থ পেলেও আনন্দিত হবে, কেননা পৃথিবীর খুব কম দেশই বিভাজন-যোগ্য পদার্থ উৎপাদনের জন্য ওকরিজের (এখানে ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈরী হয়) বা ওয়াশিংটনে হ্যান-ফোর্ডের (এখানে প্লুটোনিয়াম তৈরী হয়) মত বিরাট ও ব্যয়সাপেক্ষ কারখানা প্রস্তুত করবার সঙ্গতি রাখে। কিন্তু কোনও একটি জাতির বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানীর হাতে কয়েক গ্রাম বা কয়েক সহস্র গ্রাম এই সকল মূল্যবান বস্তু আসলেও এমন কিছু ঘটা সম্ভব নয়, যাতে রাষ্ট্রপতির মহান্ স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। ঐ ভাষণের মধ্যে এই ধারণা ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে, স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিরাপদ ও সার্থক ব্যবহার করার উপযোগী তথ্যও বিতরণ করা হবে এবং এভাবে বেলজিয়াম, ব্রেজিল বা ভারতবর্ষের মত দেশ রি-অ্যাক্টর নির্ম্মাণ করতে পারবে এবং তা থেকে চিকিৎসাবিদ্যায়, কৃষিকার্য্যে ও শিল্পকার্য্যে ব্যবহার্য্য তেজস্ক্রিয় পরমাণুকণিকা উৎপন্ন হতে পারবে এবং পারমাণবিক ক্ষমতাও সৃষ্টি করা যাবে।

কাজেই আপাত দৃষ্টিতে বোঝা না গেলেও, প্রস্তাবটির মধ্যে অনেক পরিশিষ্ট আছে। সেগুলি ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাক্।

যেদিন পরমাণু থেকে ব্যাপকভাবে আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হবে সেই দিনটিকে দ্রুত এগিয়ে আনবার স্বাধীনতা কি পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারগণ এই পরি-কল্পনা হতে লাভ করতে পারবে? বস্তু বা বিদ্যা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে এলে তারা কি জিনিষ উৎপন্ন করবে?

প্রথম প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাক্। এখন কি পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনী-য়ারগণ এমন বাধা নিষেধের মধ্যে কাজ করছেন যার জন্য শান্তিপূর্ণ ব্যবহার

সংক্রান্ত আবিষ্কার মন্থর হয়ে যাচ্ছে? আমার বিশ্বাস তাই। প্রথম বাধা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও কানাডার পারমাণবিক প্রগতি অত্যন্ত গোপনতার মধ্যে ঘটছে। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির উপর 'গোপন' ও 'অতি গোপন' চিহ্ন অঙ্কিত করে দিলে, তার ধারা কখনই দ্রুত ধাবিত হতে পারে না। এ কথা এমন কি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন বীক্ষণাগার সম্বন্ধেও খাটে। কাগজপত্র সংরক্ষণ করার ঝঞ্ঝাট এবং গোপন তথ্যটির উদ্ভাবক, পরিবাহক, বার্ত্তাবহ ও ভাণ্ডারী সকলের উপরেই তজ্জনিত যে দায়িত্ব পড়ে তাতে নূতন মূল্যবান তথ্যের আবিষ্কার ও তার আদান-প্রদান বাধাপ্রাপ্ত না হয়েই পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আইনটি আর একটি বাধার সৃষ্টি করেছে। এর ধারা অনুযায়ী পারমাণবিক শক্তির ব্যবসায়িক ব্যবহার সংক্রান্ত কোন সংবাদই কোন পররাষ্ট্রকে দেওয়া চলবে না। এর ফলে কানাডা ও গ্রেট ব্রিটেনের দক্ষ বিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ক্ষমতা উৎপাদন-কারী রি-অ্যাক্টর সংক্রান্ত কোন আলোচনাই করতে পারেন না। কাজেই প্রত্যেককেই হয়ত একই ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে অথবা একই প্রকারের ব্যর্থ প্রচেষ্টার নৈরাশ্য বহন করতে হচ্ছে। ক্ষমতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে মিত্রশক্তিদের মধ্যে) শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক ব্যবহারের দ্রুত অগ্রগতির পক্ষে এটা যে একটা বড় রকমের বাধা তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৪৬ সালে যখন এই আইনটি প্রণীত হয়, তখন নিরাপত্তার দিক দিয়ে এই প্রকার ধারার প্রয়োজন ছিল কিন্তু এখন এমন সময় এসেছে যখন নিরাপত্তার বিষয়টিকে বাস্তবভাবে পুনর্ব্বিবেচনা করা উচিত এবং রি-অ্যাক্টর সংক্রান্ত যন্ত্রবিজ্ঞানকে গোপনতার গণ্ডী থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত। ১৯৪৬ সালের পর অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। রাশিয়ানরা বোমা তৈরী করেছে। ব্রিটিশ ও কানাডিয়ানরা ক্ষমতা উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে।

জগতের পারমাণবিক বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের আর একটি অসুবিধার কথা প্রেসিডেন্ট বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তা হ'ল তাঁদের গবেষণার

মূল উপাদান, সুপরিশোধিত ইউরেনিয়াম অথবা ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং পোলোনিয়াম নামক বিভাজনযোগ্য বস্তু দু'টি সংগ্রহ করবার অক্ষমতা। কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সুইডেন প্রভৃতি দেশগুলি তাদের নিজ প্রয়াসে পরিশোধিত ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অন্য দেশগুলিও ইহা চায় এবং যাদের আছে তারা আরও চায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও গ্রেটব্রিটেন ছাড়া আর কোন দেশই ইউ-২৩৫ দ্বারা জারিত ইউরেনিয়াম প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা করতে পারেনি। অথচ পারমাণবিক ক্ষমতা উৎপাদনের জন্য এই বস্তুটিই প্রকৃষ্ট ইন্ধন এবং যারা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে চায় তারা এরই খোঁজ রাখে। আমাদের পারমাণবিক শক্তি আইন আমাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা মিত্রতাভাবাপন্ন দেশের নিকটও এই বস্তুটি বিক্রয় করা নিষেধ করে, এমন কি যখন ঐ দেশ থেকে আমরা ইউরেনিয়াম পাই তখনও। কাজেই প্রেসিডেণ্টের প্রস্তাবকে যদি কার্য্যকরী করতে হয়, তা'হলে আইনঘটিত বাধা দূর করতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে লৌহযবনিকা (এবং পাছে তাদের পারমাণবিক কার্য্যসূচীতে আমরা কোন সহায়তা করে ফেলি এই ভয়) থাকার ফলে আমরা নিজেরাই বহু সংখ্যক পর্দ্দার সৃষ্টি করেছি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মধ্যে। জগৎ জুড়ে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এইসব দেশের মধ্যে কয়েকটি দেশই আমাদের ইউরেনিয়ামের জোগান দিয়ে প্রভূত সহায়তা করেছে। কাজেই প্রেসিডেণ্টের প্রস্তাবের (নিরস্ত্রীকরণের প্রথম ধাপ হিসেবে) পিছনে আসল কথাটা হ'ল এই যে রাশিয়ানরা সম্মত হোক বা না হোক, আমাদের পারমাণবিক জ্ঞানের দেয় অংশ মিত্রশক্তিদের শীঘ্রই দিতে হবে যদি তা অস্ত্র সম্বন্ধীয় না হয়। আর বস্তু বিনিময়ও এমনভাবে করতে হবে যাতে তারা তা থেকে বোমা তৈরী না করতে পারে। নিয়ন্ত্রণের একাজ খুব কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের এটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, তারা বোমা তৈরী করতে চায় না, তারা চায় কল্যাণ।

আমাদের মিত্রশক্তিদের যে কেউ খুশী মনে স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থের

নিয়মিত হিসেব দিতে প্রস্তুত থাকবে, কি কাজে তারা ওগুলোকে লাগাবে এবং গবেষণায় কিই বা ফল হ'ল ইত্যাদি বিষয় সবই জানাবে। কেননা তারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বয়ং-বিভাজনশীল পদার্থের ধ্বংসাত্মক শক্তি কতখানি সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এই ধরণের কর্ম্মসূচী অবলম্বন করলে আমরা পৃথিবীর যে কোন স্থানে ডলার শুধু খরচ করে যে ফললাভ করব তার চেয়ে বেশীই পাওয়া যাবে।

এই প্রকার পরিকল্পনা ঠিক কিভাবে কাজ করবে? সত্যকথা বলতে গেলে আমি জানি না। কিন্তু আমি একথা মানি যে, এই প্রকারের পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার শত শত উপায় আছে। যাঁরা এ নিয়ে অন্য দেশের লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, তারা এটা স্থির করতে পারবেন। খুব বাঁধাধরা নিয়ম করার প্রয়োজন নেই। বর্ত্তমান জগতে প্রায় কুড়িটি জাতির নিজেদের পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কীয় কার্য্যসূচী আছে। যদিও তারা অস্ত্র নির্ম্মাণে উৎসাহী নয়, তথাপি তারা পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য বস্তু ও জ্ঞান দুয়ের জন্যই সমান কৌতূহলী।

আপাততঃ ধরা যাক যে প্রেসিডেন্ট যে প্রস্তাব করেছেন, রাশিয়ানরা তাতে অংশগ্রহণ করতে রাজী হবে না। অবশ্য আমি এরূপ অনুমান এজন্য করেছি যে, অতীত ইতিহাসে দেখা যায় যে রাশিয়ানরা সর্ব্বদাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকার ফলে এমন সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যা তাদের দেশের পক্ষে আর্থিক মঙ্গল বিধায়ক ও তাদের মানসিক শান্তির পরিপোষক।

যদি প্রস্তাবের কার্য্যকারিতা শুধু রাশিয়া ছাড়া অন্য দেশগুলির উপর প্রয়োগ করা যায়, তা'হলে কি ফল হবে? ধরা যাক্ 'ক' দেশটি পৃথিবীর আরও অনেক দেশের মত কয়লা, তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি মূল ইন্ধনের অভাবে জর্জ্জরিত। ঐ দেশটিকে প্রত্যেক বছরে বহু খরচা করে বহু দূর দূর দেশ থেকে কয়লা ও তৈল আমদানী করে তার বয়লারকে উত্তপ্ত করতে হবে, যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের জন্য বাষ্প পাওয়া যায়। দেশটি সস্তা ইন্ধন ও সস্তা ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। উহার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়

আছে, সেখানে দক্ষ বিজ্ঞানী আছে। বিজ্ঞানীরা জানেন পরমাণুর সম্ভাবনা কতখানি, কিন্তু তাঁদের ইউরেনিয়াম নেই। অন্ততঃ তাঁদের দেশের সরকার ভূগর্ভস্থ ইউরেনিয়াম সন্ধান করার জন্য যথেষ্ট শক্তি ও সময় ব্যয় করেনি (শেষে অবশ্যই তারা সন্ধান পাবে)।

'ক' দেশটি গবেষণার জন্য একটি রি অ্যাক্টর নির্মাণ করতে চায় এবং তদুদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ভাণ্ডারের কাছে তথ্য ও গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য সামান্য পরিমাণ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ও রি-অ্যাক্টর জ্বালাবার জন্য কিছু ইউরেনিয়াম-২৩৫ পাবার অনুরোধ জানালো। ঐ রি-অ্যাক্টর থেকে তারা ক্যানসার রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য জমির সার নিয়ে গবেষণার জন্য বা শিল্পে ব্যবহারের জন্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাবে।

কিন্তু 'ক' দেশটি ক্ষমতা উৎপাদন করতেও চায় এবং তজ্জন্য ক্ষমতা উৎপাদনকারী রি-অ্যাক্টর নির্মাণ কৌশল জানতে চায়। ইহাও সরবরাহ করা হ'ল এবং অবশেষে রি-অ্যাক্টরের উপযুক্ত ইন্ধনও সংগৃহীত হ'ল। একটি রি-অ্যাক্টর নির্মাণ করতে তিন বছর সময় লাগে। উহা পরে সার্থকভাবে চলবে কিনা, তা তত প্রয়োজনীয় নয়, যত দরকার জ্ঞানের সম্প্রসারণ, গবেষণার অগ্রগতি এবং তজ্জনিত আবিষ্কার—যে আবিষ্কার পৃথিবীর সকলে জানবে ও তার ফল উপভোগ করবে। এবং এইসব আবিষ্কার শুধু রি-অ্যাক্টর নির্মাণ কৌশল ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও হতে পারে।

কে জানে? এবং কেই বা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে? ফ্র্যাঙ্কলিন যখন ঘুড়ি দিয়ে বিদ্যুতের রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছিলেন, তার দশ বছর পরে যদি কোন লোক বিদ্যুতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতেন তা'হলে তাঁর যে অবস্থা কল্পনা করা যায়, পারমাণবিক শক্তিক্ষেত্রে আমাদেরও সেই অবস্থা।

সমাপ্ত